মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-১০

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

নভেম্বর ২০১৪ ইং, মুহাররম ১৪৩৬ হি., কার্তিক ১৪২১ বাং | محرم الحرام ١٤٣٦ نوفمبر ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৪
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৫
মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত : ৬
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত..... ১০
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
ধর্মদ্রোহিতা : কারণ ও প্রতিকার..... ১৩
মুফতী শরীফুল আজম
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১০..... ২০
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
শাহাদাতে হুসাইন (রা.) ও শিয়া সম্প্রদায় ২৬
মুফতী জিয়াউর রহমান
আশুরার তাৎপর্য ও করণীয়..... ৩০
মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৭..... ৩৫
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৬..... ৩৯
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৩
মলফূজাতে আকাবের ৪৬
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

পরস্পর সহানুভূতির এ অভাব কেটে উঠতে হবে

প্রয়োজন আধুনিকতার কিঞ্চিত পরশ। নতুন জামানার সামান্য ছোঁয়া। এর জন্য প্রস্তুত নিজেকে উজাড় করে দিতেও। হৃদয়ের পরতে পরতে শুধুই যেন চিন্তার ভিড়। সর্বপ্রকার পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক সহমর্মিতা, ধর্মীয় বাধ্যতা-ন্যায়পরায়ণতা, এমনকি আত্মার আত্মীয়তা সব কিছুর পরিবৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বেরিয়ে আসতে হবে মানবতার বন্ধন থেকেও। আধুনিকতার ছোঁয়া আমার চাই। কাঁড়ি কাঁড়ি সম্পদ হবে, নষ্টিফষ্টিতে হবে দিনাতিপাত, রাত কাটবে আকাশে, আনন্দের মুহূর্তগুলো যাপিত হবে অন্য দিগন্তে।...বাহারি স্বপ্ন।

এই যদি হয় একটি সমাজের চিন্তা-চেতনা, তাতে মানবিকতার অকাল মৃত্যু হলে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। এটি তো মানব এবং মানবিক জীবনের একটি শুদ্ধ চিত্র নয়। এর নামই যদি হয় আধুনিকতা, প্রগতি, উন্নতি ও উৎকর্ষতা তবে যাত্রীরা হুঁশিয়ার! নিশ্চিত বিপর্যয়-বিপদ-বিভীষিকা অপেক্ষমাণ।

হাল জামানায় মুসলিম সমাজের বৈচিত্র্যময় চিন্তা-চেতনা এর খুব একটা ব্যতিক্রম মনে হয় না। তথাকথিত আধুনিকতার মহামারি যেন মানবতার শেষ চিহ্নটুকু ছিনিয়ে নিতে চায় মুসলিম উম্মাহ থেকেও।

রাহমাতুললিল আলামীন, বিশ্ব শান্তির একমাত্র সফল মূর্তপ্রতীক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের প্রতিকৃত, দুনিয়াব্যাপী নিরাপত্তার পতাকাবাহী 'মুসলিম উম্মাহ' এখন অশান্তির প্রতীক হিসেবে চিত্রায়িত। এই চিত্রাঙ্কন একটি গোষ্ঠীর দীর্ঘ মেহনতের ফসল তা শতভাগ সত্য, কিন্তু এর বাস্তব প্রেক্ষাপট যে, মুসলিম বিশ্ব থেকেই ভেসে আসে, তাতে সন্দেহ পোষণের অবকাশ কোথায়?

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের খবরের কাগজগুলোতে চোখ বোলালেই দেখা যায়, মূল শিরোনামগুলো গুম, হত্যা, রাহাজানি, ত্রাস ইত্যাদি খবরেই পরিপূর্ণ।

বিশ্ব দরবারে ভৌগোলিকভাবে অতি ছোট্ট একটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ। যা দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবেই খ্যাত এবং স্বীকৃত। এত ছোট্ট পরিবারেও প্রতিদিন এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত মর্মবিদারী খবরের অভাব থাকে না। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এ দেশকে এখন খুব একটা পশ্চাৎপদ বলা যাবে না। এ দেশ থেকেও একটি 'আহ্' চিৎকার সারা দুনিয়ায় সম্প্রচারিত হতে এক মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয় না। এরূপ চিৎকারও তাদের পরিকল্পিত চিত্রাঙ্কনে ইসলামের বিরুদ্ধে কালিমা লেপনের খাতেই যোগ হয়। অথচ এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই? কিন্তু সমস্য একটিই, এটি মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। এই দেশটি মুসলিম অধ্যুষিত হওয়া শুধু ওদের কাছে কেন, নিজেদের ঘরানায় স্বয়ং মুসলমানদের কাছেও অপরাধ। এর মূলে সক্রিয় থাকে ওই 'আধুনিকতার সামান্য পরশ'। ঘটনার সূত্রপাতও হয় এই 'পরশের' কারণে, আত্মঘাতীমূলক দোষও আরোপিত হয় সামান্য 'ছোঁয়ার' উন্মত্ততায়, আবার পুরো দোষটার কলঙ্ক ইসলামের গায়ে লেপনের মূলেও থাকে ওই 'পরশ'।

অথচ ইসলামের মূল এবং বাস্তব আদর্শ হলো رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল'। الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'মুসলিম তাকেই বলা হয়, যার হাত এবং মুখ থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।'

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (নিসা ৯৩)

কুরআন-হাদীসের এরূপ অগণিত বাণীই ইসলামের আদর্শ। ইসলাম যেখানে অন্যের সমালোচনাকেও বরদাশত করে না, অন্যের প্রতি ঈর্ষা করাকেও দোষণীয় বলে আখ্যায়িত করে, সেখানে মুসলিম বিশ্বে সংঘটিত ঘটনাবলির ভিত্তিতে ইসলামের গায়ে কলঙ্ক লেপন ইসলামের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।

মুসলিম দেশসমূহে যে সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এর সাথে ইসলামের কী-বা সম্পর্ক? স্বয়ং বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে যেসব হত্যাকাণ্ড বা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, এর মধ্যে কয়টি ঘটনা ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট? ইসলামের নামে কিংবা তথাকথিত ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে কয়টি ঘটনাই বা ঘটেছে? এর হিসাব কি সবার কাছে নেই?

আমরা বলতে পারি, যা ঘটছে তা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী আদর্শ গ্রহণের কারণেই ঘটছে। আধুনিকতার ছোঁয়ার প্রত্যাশায় যারা উন্মত্ত, যারা নিজেকে সর্বপ্রকার পরিবৃত্ত মুক্ত রাখতে চায় তাদের কারণেই ঘটছে। যারা মানব জীবনের মূল্যায়নের বিপরীতে অর্থ এবং ক্ষমতাকে দাঁড় করাতে চায় তাদের কারণেই ঘটছে।

ইসলাম নির্দেশিত সহানুভূতিতে বিশ্বাসী, ধর্মীয় চেতনাপ্রসূত মানবতার মূল্যায়নে সংবেদনশীল, ধর্মীয় বিধিনিষেধ মানার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রবণ–এমন ব্যক্তির মাধ্যমে দেশ, জাতি, ধর্ম এবং মানবতা পরিপন্থী কোনো ঘটনা সংঘটিত হতে পারে না। ভাবনার বিষয় হলো, তথাকথিত আধুনিকতার নামে মানুষ ধর্মীয়, সামাজিক এবং মানবিক পরিবৃত্ত থেকে যেভাবে ছিটকে পড়ছে তা পুরো জাতি, দেশ এবং সমাজের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কারণ হবে কি না?

আল্লাহ আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৬-১০-২০১৪

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (٢)

হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল, অথচ তারা মাতাল নয়, বস্তুত আল্লাহর আযাব সুকঠিন। (সূরা হাজ-১)

রাসূল (সা.)-এর কোনো এক সফর অবস্থায় এই আয়াত নাযিল হয়। আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলে কারীম (সা.) উচ্চৈঃস্বরে এর তিলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, এই আয়াতে উল্লিখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন দিন হবে তোমরা জানো কি? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) কে সম্বোধন করে বলবেন, যারা জাহান্নামে যাবে তাদেরকে উঠাও। আদম (আ.) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, এই সময়েই ত্রাস ও ভীতির আতিশয্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হযে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম এ কথা শুনে ভীত-বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে, তারা যে দলে ভিড়বে সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গপাঙ্গো এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে তাদের সম্প্রদায়। (তাই নয় শত নিরানব্বইয়ের মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা তাদেরই হবে। তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়াত বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে :

কিয়ামত শুরু হওয়ার এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে যথা,

اذا زلزلت الارض زلزالها
وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة
اذا رجت الارض رجا

ইত্যাদি। কেউ কেউ আদম (আ.) কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধ পোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোনো খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে। (কুরতুবী)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ

কতক মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও কার্যাবলি সম্পর্কে) বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে (অর্থাৎ পথভ্রষ্টতার এমন যোগ্যতা রাখে যে, শয়তান যেভাবে তাকে প্ররোচিত করে, সে তার প্ররোচনার জালে আটকে পড়ে, কাজেই সে চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্ট, তাকে প্রত্যেক শয়তানই পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে)। (হজ-৩)

এই আয়াতটি কট্টর বিতর্ককারী নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা এবং কোরআনকে বিগত লোকদের কল্পকাহিনী বলত। কিয়ামতে পুনরুত্থানও সে অস্বীকার করত। (মাযহারী)

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তা এ ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

ভালো উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করার ফজীলত

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسئلة وسعيا على اهله وتعطفا على جاره لقى الله تعالى يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مرائيا لقى الله تعالى وهو عليه غضبان (رواه البيهقى فى شعب الايمان وابو نعيم فى الحلية)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে এবং এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সম্পদ লাভ করতে চায় যে, তার যেন কারো কছে হাত পাততে না হয় এবং সে পরিবার-পরিজনের জীবিকা ও আরামের ব্যবস্থা করতে পারে এবং প্রতিবেশীদের প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারে, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল থাকবে। আর যে ব্যক্তি হালাল উপায়েই এ উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে যে, সে খুব সম্পদশালী হবে, নিজের মর্যাদা ও গৌরব প্রদর্শন করবে এবং লোক দেখানোর জন্য দান-খয়রাত করবে, কেয়ামতের দিন সে এ অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার ওপর খুবই অসন্তুষ্ট। (বায়হাকী, আবূ নুআইম)

ব্যাখ্যা : হাদীসটি দ্বারা জানা গেল যে, ভালো উদ্দেশ্যে বৈধ পন্থায় দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করা কেবল জায়েযই নয়, বরং এটা এমন বিরাট পুণ্যময় কাজ যে, কেয়ামতের দিন এমন ব্যক্তি যখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হবে, তখন তার ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহের চিহ্ন ফুটে উঠবে। যার ফলে তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে থাকবে। কিন্তু সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্য যদি কেবল সম্পদশালী হওয়া, দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করা এবং লোক দেখানোর জন্য বিরাট বিরাট কাজ করা হয়, তাহলে এ সম্পদ উপার্জন হালাল পন্থায় হলেও এটা এমন গুনাহ যে, কেয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তা'আলার চরম ক্রোধ থাকবে। আর নাজায়েয ও হারাম পন্থায় হলে তো আর বিপদের সীমাই থাকবে না।

عن ابى كبشة الانمارى انه سمع رسول الله ﷺ يقول ثلث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه فاما الذى اقسم عليهن فانه مانقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله بها عزا ولا فتح عبد باب مسئلة الا فتح الله عليها بافقر واما الذى احدثكم فاحفظوه فقال انما الدنيا لاربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقى فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه---- (رواه الترمذى)

হযরত আবু কাবশা আনমারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, তিনটি বিষয় এমন আছে যে, এগুলোর (সত্যতার) ওপর আমি কসম খেতে পারি। আর এগুলো ছাড়া আরো একটি কথা তোমাদেরকে বলতে চাই, তোমরা সেটা স্মরণ রেখো। যে তিনটি বিষয় আমি কসম করে বলতে পারি, এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, দান-খয়রাত দ্বারা কোনো বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। (অর্থাৎ আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার কারণে কেউ কোনো দিন গরিব ও নিঃস্ব হয়ে যায় না, বরং তার সম্পদে আরো বরকত হয় এবং যার পথে সে দান-খয়রাত করে সেই মহান সত্তা তাঁর অসীম ভাণ্ডার থেকে তাকে আরো বেশি দিয়ে থাকেন)। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, কোনো বান্দা অত্যাচারিত হয়ে যদি এর ওপর সবর করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহর কোনো বান্দার ওপর অন্যায়ভাবে জুলুম-নির্যাতন করা হয় আর সে সবর করে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে দুনিয়াতেও তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।) তৃতীয় বিষয়টি হলো, কোনো বান্দা যখন ভিক্ষাবৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার ওপর অভাবের দরজা খুলে দেন। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের সামনে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করার পেশা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ী দারিদ্র্য ও অভাব তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। এ তিনটি বিষয় যেন আল্লাহর এমন অনড় সিদ্ধান্ত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি এগুলোর ওপর কসম করতে পারি।

আর এ ছাড়া যে কথাটি বলতে চাই এবং যা মনে রাখা তোমাদের কর্তব্য সেটি হচ্ছে, দুনিয়া চার ধরনের মানুষের জন্য, (অর্থাৎ এ দুনিয়াতে চার ধরনের মানুষ রয়েছে)। ১। ওই বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সঠিক জীবন পদ্ধতির এলেমও দান করেছেন। ফলে সে এ মাল-সম্পদ ব্যবহার ও খরচ করার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে, এর দ্বারা আত্মীয়স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা যথাযথ কাজে লাগায়। এ বান্দা হচ্ছে সর্বোত্তম পর্যায়ভুক্ত। ২। ওই বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা সঠিক এলেম দান করেছেন, কিন্তু তাকে ধন-সম্পদ দান করেননি। তবে তার নিয়্যাত খাঁটি ও বিশুদ্ধ। সে বলে যে, আমাকে যদি সম্পদ দেওয়া হতো তাহলে আমি অমুকের মতোই সেটা কাজে লাগাতাম। বস্তুত এই দু'জনের পুণ্য ও প্রতিদান সমান। ৩। ওই বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সেটা ব্যয় করার সঠিক জ্ঞান ও এলেম তাদের দান করেননি। ফলে এলেম না থাকার দরুন সে এ সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করে, সে এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না, এর দ্বারা আত্মীয়স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে না এবং সম্পদ যেভাবে ব্যয় করা উচিত ছিল, সেভাবে ব্যয় করে না। এ ব্যক্তি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পর্যায়ের। ৪। ওই বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদও দেননি এবং সঠিক জ্ঞান ও এলেমও দান করেননি। তার অবস্থা এই যে, সে বলে আমার যদি মাল-সম্পদ হয় তাহলে আমিও অমুক (ভোগবিলাসী ও অপচয়কারী) ব্যক্তির মতো কাজ করব। এটাই থাকে তার নিয়্যাত। তাই এ উভয় ব্যক্তির গুনাহও সমান। (তিরমিযী)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

যেমন কর্ম তেমন ফল :

হযরত (রহ.) বলেন, ডাকঘরে পোস্টম্যানের কাছে চিঠিপত্র, মানিঅর্ডার ইত্যাদি দেওয়া হয়। যাতে তিনি সেগুলো ঠিকানা অনুযায়ী পৌঁছে দেন। পৌঁছে দেওয়া তাঁর দায়িত্ব। তিনি যদি এই দায়িত্ব পালন না করে সব চিঠিপত্র আর মানিঅর্ডার নিয়ে ঘরে গিয়ে বসে থাকেন তখন তাঁর কী অবস্থা হবে? তাঁকে এই জন্য দোষী সাব্যস্ত করে বিচার করা হবে। প্রয়োজনে জেলখানায় পাঠানো হবে। সকল মানুষের অবস্থাও তেমনি। মানুষ কি মনে করে যাচ্ছেতাই চলবে, তাকে কোনো প্রকার পাকড়াও করা হবে না? এমন নয়। বরং যে লোক নিয়ম মেনে চলবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। যে নিয়ম মেনে চলবে না তাকেও পাকড়াও করা হবে। শাস্তি দেওয়া হবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

افحسبتم انما خلقنكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون۔

"তোমরা কি মনে করো তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে না?"

প্রত্যেক লোককেই দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, এসব কাজ করবে, এসব থেকে বিরত থাকবে। এসব না করার কারণে সাজা ভোগ করতে হবে। সুতরাং এর ফিকির করা এবং প্রস্তুতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।

প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুযায়ী প্রাপ্য দেওয়া হয় :

কৃতদাস তার মালিকের কাছে নিজের প্রয়োজনাদী প্রকাশ করে। কাপড় লাগবে, টাকা লাগবে ইত্যাদি। মালিকও তার প্রয়োজন মতে নিজের সামর্থ্যানুযায়ী দাসকে প্রদান করে থাকে। মানুষও যখন আল্লাহর সামনে দু'হাত তুলে দু'আ করে, নিয়মানুসারে প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেন। তার প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ তা'আলা দিয়ে দেন। দু'আর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবে না। বরং দু'আতে লেগেই থাকো। তখন আল্লাহ তা'আলা নিজের মর্জি মোতাবেক দান করবেন। কারণ এতে আল্লাহর বড়ই হিকমত রয়েছে। যেমন, প্রত্যেকে সম্পদশালী হওয়ার জন্য দু'আ করেন। অথচ যদি দুনিয়ার সকল লোককেই সম্পদশালী বানানো হয় তবে পৃথিবীর পুরো ব্যবস্থাপনাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন কেউ কারো কাজে আসবে না। কর্মচারী পাওয়া যাবে না। শ্রমিক থাকবে না। চাষি থাকবে না। ডাক্তার থাকবে না। অন্যের সেবাকারী থাকবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই দান করে থাকেন।

সফরের ডাক এসেছে পাথেয় সামলে নাও :

হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মৃত্যুর পর যদি পুনরায় জীবিত না করা হয় এবং সাজা ও পুরস্কার প্রদান করা না হয় তবে দুনিয়াতে এত কষ্ট মেহনত করা এবং স্বাদ ত্যাগ করাতে লাভ কী?

হযরত আলী (রা.) বলেন, যদি তোমার কথা ঠিক হয় তবে আমাদের কী সমস্যা? রয়ে যায় কিছু বিষয় পরিত্যাগ করা। সেগুলো তো আমাদের খুশিতেই আমরা ত্যাগ করছি। কিন্তু যদি আমাদের কথাই সঠিক হয় তবে নিজের ফিকির নিজে করো। উপমাস্বরূপ বলা যায়, কোনো লোক ঠাণ্ডার দেশে সফর করার মনস্থ করল এবং বেশ গরম কাপড়চোপড় নিয়ে সফরের রসদ বাঁধল। তার গাঁট্টি দেখে গরমের দেশের লোকেরা হাসবে। তারা বলবে এত গরম, এই লোক শীতের কাপড়চোপড় নিয়ে কোথায় যায়? এত বড় গাঁট্টি নিয়ে সে এত কষ্ট করছে কেন? কিন্তু উক্ত লোক যখন ঠাণ্ডার দেশে পৌঁছবে তখনই তার কষ্টের ফল ভোগ করবে। সেখানে পৌঁছার পর যখন দেখা যাবে খুব ঠাণ্ডা তখন সে সোয়েটার, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে খুব আরামে দিন কাটাতে পারবে। যাদের কাছে এরূপ রসদ থাকবে না তাদের তো ঠাণ্ডায় কাতর হওয়ার বিকল্প থাকবে না। সুতরাং যে স্থানে যে মৌসুম চলবে সে মৌসুম হিসেবেই রসদ জোগাড় করতে হবে। অন্যথায় তাকে অত্যধিক কষ্ট মুশাক্কাতের শিকার হতে হবে।

সেরূপ পরকালে যাওয়ার পূর্বে এর অবস্থা হিসেবে যদি তৈরি করা না হয় তবে সেখানে কঠিন থেকে কঠিন কষ্টের শিকার হতে হবে, সাজা ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। যারা দুনিয়াতে থেকে পরকালের রসদ জোগাড়ে ব্যস্ত তারা সেখানে শান্তি ও আরামের জীবন যাপন করবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

لكم فيها ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ نزلا من غفور رحيم۔

জান্নাতে তোমাদের জন্য আছে, এমন সব কিছুই, যা তোমাদের অন্তর চাবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছু, যার ফরমায়েশ তোমরা করবে। (সূরা হামীম সিজদা ৩১)

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বিভিন্ন পরিসরে প্রদত্ত হযরতের বয়ান থেকে সংগৃহীত

উত্তম ব্যক্তি

মানব সমাজে যদি একটি প্রশ্ন রাখা হয় যে, সর্বোত্তম আদর্শ পুরুষ কে? স্বাভাবিক কথা হলো, উত্তরে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী একেকজনকে সর্বোত্তম আদর্শবান পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করবে। যেমন উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি ওই ব্যক্তির ওপর নিবদ্ধ হবে যে ইলম, মারেফত ও হিকমতের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। আর বস্তুবাদীরা এই টাইটেলের অধিকারী ওই ব্যক্তিকেই মনে করবে যে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে দূর-বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে এবং সবার দৃষ্টিতে যে ঈর্ষার পাত্র। ব্যাংক-ব্যালেন্স এবং অর্থ-সম্পদে যার কোনো জুড়ি নেই। অন্যদিকে যারা খ্যাতির পাগল তারা এই টাইটেলের জন্য ওই ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত মনে করবে, যার ড্রয়িংরুম রকমারি বাহারি পুরস্কারে সজ্জিত। যার নাম-খ্যাতি শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ, ধনী-গরিব, জ্ঞানী, মূর্খ নির্বিশেষে সবার মুখে মুখে। আবার অনেকের দৃষ্টিতে এর অধিকারী সুশীল সমাজের কেউও হতে পারে, যারা (নিজেদের ভাষায়) নিজেদের জন্য নয় বরং অন্যের জন্য বেঁচে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব মতামতের প্রতিটিই সংকীর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতার স্বীকার। মানব জীবনের শুধুমাত্র বিশেষ একটি দিকের বিবেচনায় তারা এমন হতে পারে! কিন্তু উত্তম ব্যক্তি হিসেবে ধারণাকৃত এসব ব্যক্তিবর্গ জীবনের সর্ব বৃহৎ ক্ষেত্রে সর্ব নিকৃষ্ট হিসেবেও প্রমাণিত হতে পারে!

সর্বব্যাপী উত্তর

তাই এই প্রশ্নের সুন্দর ও সর্বব্যাপী উত্তর তো সেটাই, যা রাসূল (সা.)-এর পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে উত্তম এই টাইটেলের উপযুক্ত ওই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে আচার-ব্যবহারে সর্বোত্তম। ইরশাদ করেন-

خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর স্ত্রীদের সাথে আচার-ব্যবহারে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (তিরমিযী-৪০৬২)

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা আশ্চর্য মনে হতে পারে যে, এর দ্বারা বৈবাহিক জীবনকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হলো। কিন্তু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে অনুমেয় হবে যে, উত্তম ব্যক্তি নির্বাচনে সহধর্মিণীর সাথে সদাচারের চেয়ে নির্ভেজাল উত্তম কোনো কষ্টিপাথর হতে পারে না। এর দ্বারা পরখ করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অতি সহজ হবে যে, বাস্তবিকই সে উত্তম ব্যক্তি নাকি শুধুমাত্র ভদ্রতার তকমা লাগিয়ে লোক সমাজে ঘুরে বেড়ায়। কারণ মানুষকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেমন মনে হয়, বাস্তবে সে তেমন হয় না। বরং বাহ্যিক দিক তো কখনো কখনো এমন প্রতারণাময় হয় যে, বড় বড় দার্শনিক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ধোঁকায় নিপতিত হয়।

দেখুন, অনেক ব্যক্তি দ্বীনদারীর লেবাস এমন পরিপাটির সাথে পরিধান করে এবং তাকওয়া ও পবিত্রতার কৃত্রিম ক্রিম দ্বারা নিজেকে এমন আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে যে, মানুষ তার ভদ্রতা ও দ্বীনদারীর কসম করতে ও কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু যদি সামগ্রিকভাবে তার পারিবারিক জীবনের নিরীক্ষণ করা হয় তাহলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে। দেখা যাবে, ভদ্রতা, দ্বীনদারী সব ঘরের বাহিরে। ঘরে সে অত্যন্ত বদ-তমীয, স্বার্থপর, পাষান। বাহিরে ভদ্রতা দ্বীনদারীর ঢংকা বাজালেও ঘরে সে হিংস্র এবং নিত্যনতুন বর্বর নির্যাতনের আবিষ্কারক। তার মধ্যে না শরীয়তের বিধিবিধান ও শিক্ষাদীক্ষার পরোয়া আছে, আর না আছে রাসূল (সা.)-এর আদর্শের দ্বারা ঘরকে আলোকিত করে জান্নাতের বাগান বানানোর চিন্তা-চেতনা। যেখানে থাকবে না কোনো ঝগড়াঝাটি, থাকবে শুধু প্রশান্তি। যেখানে স্থান হবে না অশুভ অমঙ্গল কোনো কিছুর, স্থান হবে শুধু শুভ ও কল্যাণকর সব কিছুর। যেখানে থাকবে প্রফুল্লতা, থাকবে না সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা। বিতৃষ্ণা ঘৃণা থাকবে না, থাকবে প্রেম-ভালোবাসা।

দুর্বলের সামনে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা

দেখুন, স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার এমন একটি আয়না, যার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির আসল রূপ ফুটে ওঠে। কারণ মানুষের স্বভাব হলো, দুর্বলের সামনে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা। শারীরিকভাবে নারীরা স্পর্শকাতর হওয়ার কারণে তারা সাধারণত দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিবাহের পর আত্মীয়স্বজন, আপনজন এবং সাহায্য-সহযোগিতাকারী থেকে থাকে দূর বহুদূর। ফলে সে স্বামী ও তার পরিবার-পরিজনের রহম-করম নির্ভর হয়ে থাকে। এ কারণেই স্বামী (অনেক ক্ষেত্রে তার পরিবারের

লোকজন) অতি সাধারণ কারণে ও তার সাথে অগ্নি মূর্তি ধারণ করে। সাধারণত স্বামী (ও তার পরিবারের লোকজন) তাকে পরিবারের একজন পূর্ণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃতিও দিতে চায় না। মনে করে তাদের রহম-করমের ছায়ায় লালিত-পালিতের মর্যাদাই বা কতটুকু। এ কারণেই স্বামী (বা তার পরিবার) তার সাথে অসম্মানজনক আচার-আচরণ করতে কোনো প্রকার দ্বিধা করে না। অসংলগ্ন ভাষার ব্যবহার তো অতি সাধারণ ব্যাপার। অনেক পরিবারে তো গালাগাল ও মারধর করার মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রে মূর্খ ও শিক্ষিতের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই বললেই চলে। শিক্ষিতরা তো নিজেদের কুকর্মকে বৈধতা দেয়ার জন্য বিভিন্ন যুক্তির আশ্রয় নিতেও ভুল করে না। যেমন বলে থাকে, স্বামীর মর্যাদা রূপকার্থে খোদার সমপর্যায়ের! ইসলাম ধর্মে যদি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা বৈধ হতো তাহলে স্ত্রীদেরকে বলা হতো তারা যেন স্বামীদেরকে সিজদা করে। আরো কত যুক্তি-দলিল পেশ করে থাকে! কিন্তু যখন স্ত্রীদের অধিকারের কথা ওঠে তখন এ কথা বলে জান বাঁচানোর চেষ্টা করে যে, এ ধরনের অসংখ্য অধিকার চৌদ্দ শত বছর পূর্বেই ইসলাম নারীদেরকে প্রদান করেছে। হ্যাঁ ভাই! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম নারীদের পরিবারিক, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে পরিমাণ ইজ্জত-সম্মান ও ব্যাপক অধিকার দান করেছে, নারীবাদের ধ্বজাধারী পশ্চিমারা দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরও তার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না। ইনশাআল্লাহ! তবে প্রশ্ন হলো, ইসলামের প্রদত্ত অধিকার মুসলিম নারীরা পারিবারিক জীবনে কী পেয়েছে? নিঃসন্দেহে উত্তর 'না' সূচক হবে! এর ব্যতিক্রম দুই-চারজন থাকতে পারে। কিন্তু আমভাবে মুসলিম নারীদের অবস্থা পারিবারিক জীবনে অমুসলিম নারীদের থেকে ভিন্ন নয়। তারাও তাদের মতো পারিবারিক বৈষম্যতার শিকার, নির্যাতিতা হওয়াই তাদের ভাগ্যের লিখন। কপালিরাই এর ব্যতিক্রম হয়।

রাসূল (সা.) উত্তম ব্যক্তি হওয়ার যে কষ্টিপাথর নির্ধারণ করে দিয়েছেন এর আলোকে যদি তাঁর পবিত্র জীবনকে পরখ করে দেখা হয় তাহলে অনুমান করা সহজ হয়ে যাবে যে, রাসূল (সা.) এই ব্যাপারে পুরো মানবজাতির জন্য আদর্শ ও নমুনা। অতএব, অধিকার প্রদানের কথা স্বীকার নয়, বরং একজন মুসলমান স্বীয় জীবনে এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজের পারিবারিক জীবনকে আদর্শনীয় ও সুশোভিত করাই হবে বিচক্ষণতা ও ধার্মিকতার পরিচায়ক।

বৈবাহিক সম্পর্ক রহমত ও ভালোবাসার বৃক্ষ :

বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসা ও রহমতের এমন বৃক্ষ রোপণ করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে এই বৃক্ষের পরিচর্যা করবে, সে শুধু যে এর ফল ভোগ করবে তা নয়। বরং এর সুশীতল ছায়ার নিচ দিয়ে অতি সহজে পার্থিব জীবনের দীর্ঘ সফর শেষ করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি এর মূল্যায়ন করবে না, সে এর উপকার ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে।

দাম্পত্য জীবন স্থিতিশীল ও ফলপ্রসূ হওয়ার ফর্মুলা :

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থিতিশীল ও ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ইজ্জত-সম্মান এবং প্রেম-ভালোবাসার মুখাপেক্ষী। রাসূল (সা.)-এর বৈবাহিক জীবনে এসবের ছাপ গভীরভাবে লক্ষ করা যায়। রাসূল (সা.)-এর আচার-আচরণ, চাল-চলন নিজের জীবন সঙ্গিনীর সঙ্গে সহানুভূতি ও স্নেহময় ছিল। হুজুর (সা.) তাঁদেরকে প্রফুল্ল করতে এবং সম্মান করার মধ্যে কোনো ত্রুটি বা কমতি করেননি। এ ব্যাপারে ছোট ছোট বিষয়েও তিনি খেয়াল রাখতেন। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা প্রদত্ত হলো।

সান্ত্বনা প্রদান

বর্ণিত আছে যে, হযরত ছাফিয়্যাহ (রা.) কোনো এক সফরে হুজুর (সা.)-এর সাথে ছিলেন, তিনি যে উটে আরোহন করেছিলেন তা অত্যন্ত ধীরগতির হওয়ার কারণে ক্রন্দন করতে শুরু করেন। এতদদর্শনে রাসূল (সা.) তাঁর নিকট এসে স্বহস্তে তার চোখের পানি মুছে দেন এবং তাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। (আসসসুনানুল কুবরা-নাসাঈ হা. ৯১১৭)

স্ত্রীর প্রশংসা

রাসূল (সা.) স্ত্রীদের প্রশংসা করার মধ্যেও কোনো কমতি করতেন না। বরং ভরপুর মজলিসে প্রশংসা করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। যেমন একবার ইরশাদ করেন- انى قد رزقت حبها খাদিজার প্রতি আমার প্রচণ্ড ভালোবাসা রয়েছে।" (মুসলিম হা. ২৪৩৫)

আরেকবার হযরত আয়েশা (রা.)-এর ব্যাপারে বলেন, "খাদ্যের মধ্যে যেমন ছরীদ সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি নারীদের মধ্যে আয়েশা শ্রেষ্ঠ।" (বোখারী হা.-৩৪১১)

এক পাত্রে পান করা :

বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) পেয়ালার যেখানে মুখ রেখে পান করতেন রাসূল (সা.) সেখানে মুখ রেখে পান করতেন এবং একই হাড্ডির গোস্ত আয়েশা (রা.) খেয়ে রাসূল (সা.)-এর হাতে দিলে রাসূল (সা.) সেখান থেকেই খেতেন, যেখান থেকে আয়েশা (রা.) খেয়েছেন। (নাসাঈ হা. ৭০)

একসঙ্গে গোসল করা

বর্ণিত আছে যে, "রাসূল (সা.) এবং হযরত মাইমুনা (রা.) একই সাথে একই মগ দিয়ে একই ভাণ্ডের পানি দ্বারা

গোসল করেন। (নাসাঈ-হা. ২৪০)

মেজাজ বোঝা :

রাসূল (সা.) শুধুমাত্র স্ত্রীদেরকে আনন্দদানের খেয়াল করতেন শুধু তাই নয়। বরং তিনি তাঁদের মেজাজ ও স্বভাব সম্পর্কে ছিলেন পরিপূর্ণ ওয়াকিফ। এমনকি তাদের চোখের ইশারাও সহজে বুঝে ফেলতেন যে কী বোঝাতে চাচ্ছে! যেমন একবার হযরত আয়েশা (রা.) কে বলেন, আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি অভিমান করো, আর কখন স্বাভাবিক সন্তুষ্ট থাকো। আয়েশা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন? রাসূল (সা.) বলেন, যখন তুমি অভিমান করো তখন বলো-, ورب ابراهيم (ইবরাহীমের রবের কসম) আর যখন খুশি থাকো, তখন বলো- ورب محمد (মুহাম্মদের রবের কসম)। আয়েশা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিষয়টি এমনই। তবে মুখে আপনার নাম উল্লেখ না করলেও অন্তর আপনার ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে। (মুসলিম ২/২৮৫)

সম্মানজনক আচরণ

রাসূল (সা.) স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ করতেন। যেমন, একদা হযরত ছাফিয়্যাহ (রা.) হুজুর (সা.)-এর সাথে ই'তিকাফকালীন সাক্ষাতের জন্য আসেন, সাক্ষাৎ শেষে ফিরে যাওয়ার সময় রাসূল (সা.) তাঁকে একটু এগিয়ে দেন। (বুখারী ১/২৭৩)

মতামত গ্রহণ

পারিবারিকভাবে নারীদেরকে যেহেতু বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় না, তাই গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ বা তাদের মতামত জানার চেষ্টাও করা হয় না। কোনো ক্ষেত্রে তাদের মতামত গ্রহণ করা হলেও তা আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত স্বামী গ্রহণ করবে আর বেগম সাহেবা শুধুমাত্র শুনে থাকবে আর মেনে চলবে, এটাই তার একমাত্র দায়িত্ব। অথচ রাসূল (সা.)-এর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি শুধু পারিবারিক বিষয়েই নয়, প্রয়োজন হলে উম্মতের ব্যাপারেও স্ত্রীদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করতেন এবং তা বাস্তবায়ন করতেন। যেমন হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদন হওয়ার পর রাসূল (সা.) সাহাবাদেরকে বলার পরও যখন তাঁরা ভগ্নহৃদয়ের কারণে কুরবানী এবং হলক কোনোটাই করলেন না, তখন রাসূল (সা.) মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করেন এবং হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রাসূল (সা.) নিজের কুরবানী এবং হলককর্ম সম্পাদন করলে সাহাবায়ে কেরাম ও নিজেদের কুরবানী এবং হলক সম্পন্ন করে নেন। (বুখারী ১/৩৮০)

পারিবারিক কাজে সহযোগিতা

ঘরের কাজকর্মে স্ত্রীদেরকে সহযোগিতা করার প্রতি পুরুষদের কোনো আগ্রহ নেই বললেই চলে, অনেকে আবার এটাকে মানহানিকর মনে করে থাকে। ছোট ছোট বিষয়ে তারা স্ত্রীনির্ভর হয়ে থাকে। হায় রে মান রে! অথচ রাসূল (সা.) ঘরের কাজকর্মে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন। যেমন, "হযরত আয়েশা (রা.) কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো যে, রাসূল (সা.) ঘরে কী কাজ করতেন? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ঘরের কাজকর্মে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন।" (মিশকাত-৩৫১৯)

"অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল (সা.) নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। নিজেই নিজের জুতা মেরামত করতেন। ঘরে যেসব কাজ পুরুষরা করে থাকে রাসূল (সা.)ও সেসব কাজ নিজেই করতেন।" (মিশকাত-৫২০)

বিনোদন

মানুষের স্বভাবজাত বিষয় হলো, সে অবিরাম কাজের ফলে ক্লান্ত হয়ে ওঠে, কাজের প্রতি অনীহা ভাব চলে আসে। এমতাবস্থায় ক্লান্তি দূর করার জন্য প্রয়োজন অনুভব হয় একটু বিনোদন করার। যেন নব উদ্যমে জীবনের পথ চলা শুরু করা যায়। ইসলাম যেহেতু মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম, তাই মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা বিনোদনের প্রতি আকর্ষণকে পুরো করার জন্য শরীয়তের গণ্ডির মধ্য থেকে জায়েয এবং বৈধ পন্থায় প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করার যাবতীয় পথ উন্মুক্ত রেখেছে। স্বয়ং রাসূল (সা.) শুধু প্রকাশ্যে নয়, নির্জনেও উম্মুহাতুল মুমিনীনদের সাথে বিনোদন করেছেন এবং নিজের পারিবারিক জীবনকে সর্বপ্রকার কলহ-বিবাদমুক্ত পুষ্প বাগানে পরিণত করেন। যেমন একবার হাবশী কিছু লোক মসজিদে নববীর সামনে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিল, তখন রাসূল (সা.) নিজের পক্ষ থেকেই হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তাদের মহড়া দেখতে আগ্রহী? হযরত আয়েশা (রা.) হ্যাঁসূচক উত্তর দিলে রাসূল (সা.) ঘরের দরজায় আয়েশাকে চাদর দ্বারা আড়াল করে দাঁড়িয়ে যান। আর হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধ ও কান মুবারকের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়ে তাদের মহড়া দেখতে থাকেন। হযরত আয়েশা (রা.) নিজে নিজে প্রস্থান না করা পর্যন্ত রাসূল (সা.) এভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। (বুখারী হা. ৫১৯০)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কোনো এক সফরে হযরত আয়েশা রাসূল (সা.)-এর সাথে ছিলেন। (এক নির্জন স্থানে) রাসূল (সা.)-এর সাথে তিনি দৌড় প্রতিযোগিতা দেন এবং তিনি জিতে

যান। আয়েশা (রা.) বলেন, পরবর্তীতে আমি যখন একটু মুটিয়ে যাই তখন আবার রাসূল (সা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিই, এবার রাসূল (সা.) জিতে যান। (আবু দাউদ হা. ২৫৭৮)

আরেক হাদীসে বর্ণিত যে, যখন রাসূল (সা.) ঘরে থাকতেন না তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সখীরা আয়েশার নিকট চলে আসত এবং খেলাধুলায় মেতে উঠত। কিন্তু হুজুর (সা.) ঘরে আগমন করার সাথে সাথে সবাই চলে যেত। তখন রাসূল (সা.) সবাইকে ডেকে একত্রিত করে নিজেই ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন। এভাবেই রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে সখীদের সাথে সময় কাটানো এবং খেলাধুলা করার সুযোগ করে দিতেন। (বুখারী-৬১৩০)

সংশোধনের পদ্ধতি

স্বাভাবিক জীবনের ন্যায় পরিবারিক জীবনও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়। কথার ফুলঝুড়ির মধ্যেও এমন কথা শুনতে হয়, যা গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। নববী নীড়ও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু রাসূল (সা.) যদি কোনো উম্মুল মুমিনীনের মুখে অসংলগ্ন কোনো কথা শুনতেন তাহলে তাঁকে ধমকানো বা তিরস্কার করা ছাড়া দার্শনিক পন্থায় এমনভাবে ভুল সংশোধন করে দিতেন, যেন সংশোধনও হয়ে যায় আবার মানসিকভাবে ভেঙেও না পড়ে। এমনই একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। "একদা রাসূল (সা.) ঘরে তাশরীফ নিয়ে দেখেন হযরত ছফিয়্যাহ (রা.) কান্নাকাটি করতেছেন। রাসূল (সা.) তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হাফসা (রা.) আমাকে ইহুদীর বাচ্চি বলে গালি দিয়েছেন। এ কথা শুনে রাসূল (সা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এর মধ্যে দোষের কী আছে? বরং এর মধ্যে তো এমন সম্মান রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তোমাকেই দিয়েছেন। তুমি হাফসাকে বলে দাও যে, আমার স্বামী নবী, আমার পিতা নবী এবং আমার চাচাও নবী। অতএব আমার সাথে তুমি কিসের বড়াই করো। এরপর হাফসাকে লক্ষ্য করে বলেন, হাফসা আল্লাহকে ভয় করো।" (তিরমিযী, হা. ৩৮৯৪)

বৈরী পরিস্থিতি

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ, কথাকাটাকাটি এবং মান-অভিমান একটি আশ্চর্য জিনিস। আসল কথা হলো, পিয়ার ও মুহাব্বতের জগতের নিয়মকানুন দুনিয়ার সাধারণ আইনকানুন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে হারলে জিতে, জিতলে হারে। অতএব যে নাদান এই বাস্তবতাকে বোঝে না এবং তিলকে তাল বানিয়ে ফেলে, এই সম্পর্কের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চনাই তার ভাগ্যে জোটে।

অপ্রীতিকর বৈরী পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) নিজেকে বিবিদের থেকে দূরে রাখতেন। যেমন উম্মুহাতুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে অধিক পরিমাণ খোরপোষ চাওয়ার কারণে করেছিলেন। অপ্রীতিকর কিছু হলে রাসূল (সা.)-এর পদক্ষেপ এটাই হতো। এখানেও রয়েছে পুরুষদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু।

সন্দেহ

বৈবাহিক জীবনের মসৃণ সরলপথ কখনো কখনো এমন কণ্টকাকীর্ণ হয়ে ওঠে যে, পথচলা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যায়। অনেকে তো এসব ক্ষেত্রে নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পেরে দুর্ঘটনার শিকার হয়। কারণ বৈবাহিক জীবনে বিশ্বাসঘাতকতামূলক সন্দেহ (যেমন পরকীয়া) এমন একটি বিষয়, যার কল্পনাও যেকোনো স্বামীর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। এটা এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যা একজন নম্র-ভদ্র ব্যক্তিকেও ক্রোধান্বিত করে। কখনও কখনও অতিমাত্রায় রাগের কারণে অত্যন্ত ভয়ানক পদক্ষেপও গ্রহণ করে ফেলে। অর্থাৎ তালাকের মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন স্বয়ং রাসূল (সা.) হয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় যা ইফকের ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। মুনাফিকদের অপবাদের কথা রাসূল (সা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, "হে মুসলমানগণ! আমার পরিবারের ব্যাপারে কিছু কষ্টদায়ক কথা আমার কানে পৌঁছেছে। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর (আয়েশার) ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না।" এরপর সরাসরি হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে এই ব্যাপারে কথা বলেন এবং বলেন যে, আমার কানে তোমার ব্যাপারে এমন এমন কথা পৌঁছেছে, তুমি যদি এই অপবাদ থেকে মুক্ত হও তাহলে আল্লাহ তোমাকে এর থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তোমার দ্বারা এ-জাতীয় কোনো কিছু হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার করো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.) এর পবিত্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে পাকে একাধিক দীর্ঘ আয়ত নাযিল করেন। (বুখারী ২/৫৯৫-৫৯৬)

নমুনাস্বরূপ, নববী জীবনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। নচেৎ সীরাতে নববী এ ধরনের অসংখ্য ঘটনায় ভরপুর। একজন মুসলমান যদি তার বৈবাহিক জীবনে নববী আদর্শের অবতারণা করে তাহলে সে বৈবাহিক জীবনের অনেক মারপ্যাঁচ এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

গ্রন্থনা : মুফতী নুর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

কওমা তথা রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য থাকলেও এটা নিয়ে একপক্ষ অন্যপক্ষের সাথে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করে না। আর এটা বাড়াবাড়ি করার মতো কোনো বিষয়ও নয়। এতদ্বসত্ত্বেও এ বিষয়ে কলম ধরতে হচ্ছে আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবী ভাইদের কল্যাণে(?)। আমরা নিম্নে রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষের দলিল তুলে ধরে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করে দেখাব যে, এ ক্ষেত্রে হানাফীদের আমলই হাদীস ও আসারে সাহাবা দ্বারা সুপ্রমাণিত। আহলে হাদীস ভাইয়েরা যে হাদীসের ওপর ভিত্তি করে হানাফীদের বিপরীত আমল করে সেটা বিভিন্ন কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

কওমা থেকে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তারীকার ব্যাপারে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের দুই ধরনের মতামত রয়েছে।

১. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাঁটু জমিনে রাখবে এরপর দুই হাত সিজদার স্থানে রাখবে। আর সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে হাত জমি থেকে উঠাবে এরপর হাঁটু জমি থেকে তুলবে।

২. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাত জমিনে রাখবে এরপর দুই হাঁটু জমিনে রাখবে। আর সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে হাঁটু জমি থেকে উঠাবে এরপর দুই হাত জমি থেকে তুলবে।

প্রথমোক্ত মতের প্রবক্তাগণ : হানাফী মাযহাবে প্রথম মত গ্রহণ করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের মতামত আরো যাদের থেকে বর্ণিত তারা হলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্য থেকে : হযরত উমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), হযরত আনাস (রা.) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.)। তাবেঈ এবং তাবয়ে-তাবেঈদের মধ্য থেকে : ইবরাহীম নাখয়ী, ইবনে সীরীন, আবু কিলাবাহ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়া, সুফিয়ান সাওরীসহ আরো অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিস রহিমাহুমুল্লাহ। ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর ভাষ্যানুযায়ী 'অধিকাংশ ফুকাহা ও মুহাদ্দিস প্রথম মতের প্রবক্তা এবং তারা এ অনুযায়ী আমল করে আসছেন।' (সুনানে তিরমিযী হা. নং ২৬৮, আল মুগনী ইবনে কুদামাহ : ১/৩০৩, যাদুল মাআদ : ১/২১৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২৬৯ শামেলা)

দ্বিতীয় মতের প্রবক্তা : বর্তমান যমানার আহলে হাদীস (লা-মাযহাবী) নামধারী ফেরকা এই মত গ্রহণ করেছে।

প্রথমোক্ত মত তথা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাঁটু জমিনে রাখবে এরপর দুই হাত সিজদার স্থানে রাখবে। আর সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে হাত জমি থেকে উঠাবে এরপর হাঁটু জমি থেকে তুলবে।

প্রথম মতের স্বপক্ষে-

হানাফীদের দলিল :

১.

عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

'হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) বলেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাতের পূর্বে দুই হাঁটু জমিনে রাখতে দেখেছি এবং ওঠার সময় দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত জমিন থেকে উঠাতে দেখেছি।' (সুনানে আবু দাউদ হা. নং ৮৩৮, সুনানে তিরমিযী হা. নং ২৬৮, সুনানে দারেমী হা. নং ৩০৩, সহীহ ইবনে খুযাইমা হা. নং ৬২৬, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আসার বাইহাকী : ৩/৬৪ শামেলা) এই হাদীসের সনদকে ইমাম তিরমিযী এবং হাকেম নিশাপুরী যথাক্রমে হাসান এবং সহীহ বলেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়া (রহ.)ও এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। সুনানে দারেমীতে হাদীসটিকে হাসান বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী কিতাবুল ঈমান : ৬/৫৩, যাদুল মাআদ : ১/২১৬ শামেলা)

২.

عن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.

'হযরত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমরা এক যমানায় সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর আগে হাত রাখতাম, এরপর আমাদেরকে হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতে আদেশ করা হয়।' (সহীহ ইবনে খুযাইমা : ৩/৩১৮)

৩.

عن ابى هريرة يرفعه أنه قال إذا سجد أحدكم فليبتدء بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل.

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন প্রথমে যেন দুই হাঁটু জমিনে রাখে, পুরুষ (উট)-এর মত যেন না বসে, (অর্থাৎ আগে যেন হাত না রাখে, কারণ এটাই উটের বসার নিয়ম)।'

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১৩/৪৮৬ শামেলা)

এসব হাদীস দ্বারা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সুন্নাত তরীকার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মতামত দৃঢ়ভাবে সঠিক ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলো। এতদসত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে লা-মাযহাবী ভাইদের হানাফী মাযহাব ছেড়ে অন্য মতামত গ্রহণ করা সমাজে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তাদের দলিল ও তার খণ্ডন নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

লা-মাযহাবীদের দলিল :

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير.

'হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন সে যেন দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত জমিনে রাখে। আর উটের মতো যেন না বসে।' (সুনানে নাসাঈ হা. নং ১০৯০, সুনানে আবু দাউদ হা. নং ৮৪০, হাদীসটি হাদীসের আরো অন্যান্য কিতাবে আছে)

হাদীসটির সনদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ মিশ্রপ্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন : কেউ হাসান, কেউ সহীহ, কেউ যয়ীফ বলে মন্তব্য পেশ করেছেন। কেউ মুনকারও বলেছেন। যেমন হামযাহ আল-কেনানী (রহ.) এই হাদীসকে মুনকার বলেছেন। (ফাতহুল বারী কিতাবুল ঈমান : ৬/৫৩) তবে প্রথমোক্ত হাদীসটি দ্বিতীয়োক্ত হাদীসের ওপর অন্য কয়েকটি কারণে প্রাধান্য পায়। কারণগুলো 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থ থেকে নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. লা-মাযহাবীদের হাদীসটিকে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের কারণে অনেক মুহাদ্দিস মানসূখ (রহিত) বলেছেন। যেমন ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, 'আমাদের মাযহাবের অনেক ফুকাহা এই হাদীসটিকে মানসূখ মনে করেন।' (যাদুল মাআদ : ১/২১৫) তাছাড়া সহীহ ইবনে খুযাইমার সংকলকও এই হাদীসটিকে মানসূখ বলেছেন। (সহীহ ইবনে খুযাইমা : ৩/৩১৮) আর ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসীন হযরত এ ব্যাপারে একমত যে, মানসূখ হাদীস কোনো আমলের স্বপক্ষে দলিল হতে পারে না। অতএব, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা তাদের আমলের পক্ষে যে দলিল পেশ করছে সে দলিল গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সেটা মানসূখ অর্থাৎ রহিত হয়ে গেছে।

২. যদি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত লা-মাযহাবীদের হাদীসটিকে মানসূখ নাও মানা হয়, তাহলে এটার 'মতন মুযতারিব'। অর্থাৎ হাদীসের মূল পাঠ ওলট-পালট হয়ে গেছে। কারণ হাদীসের প্রথম অংশে যে কাজ করতে বলা হয়েছে দ্বিতীয় অংশে সেটাই নিষেধ করা হয়েছে। এভাবে যে, হাদীসের প্রথম অংশে দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত রাখতে বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশে উটের মতো বসতে নিষেধ করে মূলত হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতেই নিষেধ করা হয়েছে। কেননা উট বসার সময় প্রথমে হাত তথা সামনের দুই পা জমিনে বিছায় এরপর পেছনের দুই পা বিছিয়ে বসে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর থেকে বর্ণিত মতনই সঠিক। আমাদের বর্ণিত তিন নং দলিলে স্বয়ং হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় লা-মাযহাবীগণ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছে, সেটা বর্ণনা করার সময় কোনো বর্ণনাকারী ভুলবশত শব্দ আগ-পিছ করে ফেলেছে। এ হিসেবে আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস (যেটা লা-মাযহাবীদের দলিল)-এর মূলপাঠ আসলে এমন ছিল : إذا سجد أحدكم فليضع ركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك البعير 'তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন সে যেন নিজ দুই হাঁটু দুই হাতের পূর্বে রাখে এবং উটের মতো যেন না বসে।'

হাদীসের মূলপাঠ এমন ধরা হলে, হাদীসের প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয়াংশের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয় না এবং আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত দুই হাদীস একটি আরেকটির বিপরীত হয় না।

এসব আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো, লা-মাযহাবী ভাইদের দলিলটি 'মুযতারিবুল মতন' বা 'মাকলূব'। আর মুযতারিব হাদীস দলিল হওয়ার উপযুক্ত নয়। ফলে রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার ব্যাপারে লা-মাযহাবী ভাইদের দলিলটি গ্রহণ করা গেল না।

৩. ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের পক্ষে একাধিক সাহাবী (রা.)-এর আমল রয়েছে। যেমন : হযরত উমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, হযরত আনাস প্রমুখ সাহাবা (রা.)। অথচ আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের ওপর একমাত্র ইবনে উমর (রা.) ছাড়া অন্য কোনো সাহাবীর আমল পাওয়া যায় না। ইবনে উমর (রা.) থেকে আবার ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.)-এর হাদীস মোতাবেক আমলও বর্ণিত আছে। তাই আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের ওপর ইবনে উমর (রা.)-এর আমল থাকা না থাকার মতই।

৪. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে মুসল্লীকে বিভিন্ন প্রাণীর সাদৃশ্যতা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন : শিয়ালের মতো এদিক-সেদিক তাকাতে, হিংস্র

প্রাণীর মতো হাত বিছিয়ে রাখতে, কাকের মতো ঠোকর দিতে, কুকুরের মতো বসতে, অবাধ্য ঘোড়ার লেজ নাড়ার মতো বারবার হাত উঠাতে এবং উটের মতো সিজদায় যেতে নিষেধ করেছেন। অথচ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ওপর আমল করলে সিজদায় যাওয়ার সময় উটের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা থেকে বাঁচা যায় না। তাই সিজদায় যাওয়ার সময় উটের সাদৃশ্যতা অবলম্বন থেকে বাঁচার জন্য ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ওপর আমল করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। (বিস্তারিত দেখুন 'যাদুল আমাদ : ১/২১৫, আল মুগনী ইবনে কুদামাহ : ৩০৩)

এসব কারণ বিবেচনায় উম্মতের অধিকাংশ ফকীহ এবং মুহাদ্দিস হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে আমলযোগ্য মনে করতে পারেননি। বরং ১৪ শ বছর ধরে তারা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.)-এর হাদীস অনুযায়ী আমল করে আসছেন। শান্তিপূর্ণ মুসলিম সমাজে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির লক্ষ্যেই লা-মাযহাবী ভাইয়েরা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত অগ্রহণযোগ্য হাদীসটিকে সম্বল বানিয়েছে, আর আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এ ব্যাপারে মা'মূল বিহী যে হাদীসটি ছিল (আমাদের তিন নং দলিল) সেটি তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেটা গ্রহণ করার দ্বারা তো সমাজে ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়ানো যাবে না! আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমাদেরকে তাদের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

তানযীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হিফজের শিক্ষক সাহেবানদের জন্য

দশ দিনব্যাপী হিফজ প্রশিক্ষণ-২০১৪ইং

তারিখ : **২২ নভেম্বর শনিবার হতে ১ ডিসেম্বর সোমবার পর্যন্ত। (মোট দশ দিন)**
উদ্বোধনী সবক : **প্রথম দিন সকাল ১০টায়।**
স্থান : **তানযীম মিলনায়তন, তানযীম ভবন, জমিল মাদরাসা, বগুড়া।**

দীর্ঘদিনের সফল, অভিজ্ঞ হাফেজ ও কারী সাহেবানগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।
আশা করি, হিফজের সার্বিক মানোন্নয়নকল্পে হাফেজ সাহেবগণ যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন।

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

ধর্মদ্রোহিতা : কারণ ও প্রতিকার

মুফতী শরীফুল আজম

ধর্মদ্রোহী কৃতঘ্ন :

মানব জাতির সুখ, শান্তি, সফলতা আর মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে একমাত্র ইসলাম নামক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার মাঝে। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট বিধিবিধান। মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে এ সকল হুকুম-আহকামের মঙ্গলামঙ্গল বিচার করা সম্ভব হবে না। ঈমান আর ইসলামের মূল শিক্ষাই হচ্ছে সমর্পণ। মহান আল্লাহর হুকুম আর তাঁর রাসূলের আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালনা করাই একজন মুমিনের কর্তব্য। এর মাঝেই নিহিত রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ আর পরকালীন সফলতা।

মানবতার মুক্তির এই সনদ নিয়ে বার্তাবাহক হিসেবে সর্বশেষ যাকে এ ধরাতে প্রেরণ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। বিশ্ববাসীর তরে যিনি ছিলেন শান্তির দূত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

মানব-দানব, জীব-জন্তু, তরুলতা বা জড় পদার্থসমূহ সবই এই রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) সবার জন্যই ছিলেন রহমতস্বরূপ। কেননা, আল্লাহর যিকির ও ইবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টজগতের প্রকৃত রূহ বা প্রাণ। যেদিন পৃথিবী থেকে এই রূহ বিদায় নেবে এবং আল্লাহ-আল্লাহ বলার মতো কেউ থাকবে না সেদিন কিয়ামত এসে যাবে। সব কিছু ধ্বংস করে দেয়া হবে। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রচেষ্টা, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর পবিত্র শিক্ষার বদৌলতেই দুনিয়াতে আল্লাহর যিকির ও ইবাদত-বন্দেগী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ হিসেবে কিয়ামত অবধি আগত সকল মাখলুকের প্রতি থাকবে তাঁর করুণা।

তাঁর আগমন সমগ্র মানবতার জন্য ছিল আল্লাহ তা'আলার সর্ববৃহৎ অনুগ্রহ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।" (সূরা আলে ইমরান-১৬৪)

বস্তুবাদের দাস আধুনিক মানুষের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ আর নেয়ামত বলতে শুধু সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকেই মনে করা হয়, যাতে উদর পূর্তি বা জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ মজুদ থাকে। আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টি তাদের মনে কখনো উঁকি মারে না বা বিবেচনায় আসে না।

অথচ মানুষের মূল সত্তা শুধু কতেক হাড়গোড় ও চর্ম-মাংসের সমষ্টি নয়, বরং মানুষের প্রকৃত তাৎপর্য হলো সে আত্মা, যা তার দেহের সাথে যুক্ত। নবী-রাসূলগণ (আ.) পৃথিবীতে আগমন করেছেন এই মানবাত্মার যথার্থ পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্য। যাতে তারা হিংস্র জীবজন্তুর ন্যায় অপরের কষ্টের কারণ না হয়ে মানবতার পক্ষে কল্যাণকর প্রতিপন্ন হতে পারে।

তাই তো দেখা যায় নবীজি (সা.)-এর কাছে দীক্ষা পেয়ে জাহেলিয়াতের যুগের লোকেরা হিরক খণ্ডে পরিণত হয়। যাদের মাঝে নিজেকে পরিচালনা করার মতো ছিল না কোনো নীতি-নৈতিকতা, মনুষ্যবোধ তারাই পরিণত হয়েছে বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের দিশারি। যাদের নাম শুনলে সম্মানার্থে বলতে হয় 'রাযিআল্লাহু আনহু'। নবীজি (সা.)-এর এই নূরানী আদর্শ অনুস্মরণে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার পথ সকলের জন্য রয়েছে অবারিত। তাঁর অস্তিত্ব সত্যি মানবজাতির তরে করুণাময়ের সর্ববৃহৎ করুণা হিসেবে স্বীকৃত।

নবীজি (সা.) ছিলেন প্রতিটি মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় হিতৈষী। পবিত্র কুরআনে এর সাক্ষ্য দিয়ে বলা হয়েছে-

"নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের জান অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ।" (সূরা আল আহযাব-৬)

সহীহ বোখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজি (সা.) ইরশাদ করেছেন। এমন কোনো মুমিনই নেই, যার পক্ষে আমি ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চেয়ে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নই।

নবীজি (সা.) প্রতিটি মানুষকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের অনাবিল সুখ পাইয়ে দিতে ছিলেন উদগ্রীব। মানুষের হেদায়েতের জন্য তাঁর এই ব্যাকুলতা দেখে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে

সান্ত্বনার বাণী অবতীর্ণ হয়। ইরশাদ হচ্ছে-

" যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।" (সূরা কাহফ-৬)

নবীজি (সা.) তায়েফবাসীর জুলুম-নির্যাতনের বদলা না নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হেদায়েতের প্রত্যাশায় যে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন ইতিহাসে তা এক বিরল ঘটনা। পাহাড়ের অধিকর্তা ফেরেশতা এসে সেদিন তায়েফের 'আখশবায়ন' নামক পাহাড় দুটিকে পরস্পর সঙ্ঘৃষ্ট করে কাফেরদেরকে নিষ্পেষিত করে ফেলার অনুমতি প্রার্থনা করলে নবীজি (সা.) বললেন- না, না, তারা বেঁচে থাকুক। হয়তো তাদের ঔরস হতে এমন সৎ ও মহৎ লোক জন্মগ্রহণ করতে পারে, যারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর ইবাদত করবে। (বোখারী, মুসলিম)

নশ্বর এ ধরাতেই শুধু নয় বরং পরকালের কঠিন থেকে কঠিন ঘাঁটিসমূহেও উম্মতের জন্য নবীজি (সা.)-এর ব্যাকুলতা দেখে আল্লাহ তা'আলার দয়ার সাগরে ঢেউ উঠতে থাকবে। সকল নবী-রাসূলগণ (আ.) যখন নফসী, নফসী বলে আত্মমগ্ন থাকবেন তখন দয়াল নবী মুস্তফা (সা.) উম্মতী-উম্মতী বলে আর্তনাদ করতে থাকবেন। তার শাফায়াতের বদৌলতে হাশরবাসীর কষ্ট-দুর্দশা লাঘব হবে। হাউজে কাউসার থেকে তিনি যাকে পানি পান করাবেন সে আর কখনো তৃষ্ণার কষ্ট অনুভব করবে না।

এমন দয়ার আধার, জনহিতৈষী মানবতার পরম বন্ধু মুক্তির দূত মহামানবের আনুগত্য তাঁর আদর্শ-অনুসরণ, তাঁর আনীত ধর্ম বিধান মনেপ্রাণে মেনে নেয়াই হবে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। এর বিপরীত তাঁর প্রতি অবজ্ঞা-উপহাস তাঁর আনীত সত্য ধর্ম ইসলামের অবমাননা আর পৃষ্ঠপ্রদর্শন হবে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলার বিশাল অনুগ্রহ আর দয়ার প্রতি না শোকরি। এমন কৃতঘ্ন বান্দার জন্য যত কঠিন সাজার ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, তা সামান্য বলে বিবেচিত হবে। বিচার দিবসে তাদেরকে খোদাদ্রোহী হিসেবে উত্থাপিত করা হবে।

খোদাদ্রোহিতার নিগুঢ় রহস্য :

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি দুই ভাগে বিভক্ত, জামাল ও জালাল। একদিকে যেভাবে তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল, অপরদিকে তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রভাবশালী। উভয় গুণাবলি নিজ বান্দাদের মাঝে প্রকাশ করার ইচ্ছায় তিনি মানুষদেরকে একটি জীবন বিধান দিয়ে দুনিয়াতে পাঠালেন এবং তা পরিপালন করা না করার এখতিয়ার-ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করলেন। অতঃপর এই কঠিন পরীক্ষায় মানবজাতি দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল, অনুগত এবং বিদ্রোহী। পরিণতিতে এক দল জান্নাতী, অপরদল জাহান্নামী হলো আর আল্লাহ তা'আলার উভয় গুণ সিফাতে জালাল ও জামালের বহিঃপ্রকাশের পথ সুগম হলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- "আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতি সত্তায় পরিণত করতে পারতেন আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না। তোমার পালনকর্তা যাদের ওপর রহমত করেছেন। তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে এবং এ জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার পালনকর্তার কথাই পূর্ণ হলো যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব।" (সূরা হুদ ১১৮-১১৯

অতএব একদল মানুষ সর্বযুগেই আল্লাহর হুকুম ও নবী-রাসূলগণের শিক্ষার বিরোধিতা করে নিজেকে জাহান্নামের উপযোগী করতে থাকবে এতে তাদের কোনো অনুশোচনা থাকবে না। পক্ষান্তরে একদল নবী-রাসূলগণের শিক্ষাকে অনুস্মরণ করে আল্লাহর রহমত লাভ করবে। (তরজমা শায়খুল হিন্দ পৃ. ৩১১)

বিদ্রোহের সূচনা :

ইবলিশ শয়তান কর্তৃক হযরত আদম (আ.) কে সিজদা করার খোদায়ী নির্দেশ উপেক্ষার মধ্য দিয়ে সূচিত হয় খোদাদ্রোহিতা। এর পর থেকে ইবলিশের প্ররোচনায় তার দলে যোগ হতে থাকে বনী আদম। সেদিন ইবলিশ অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার প্রাক্কালে মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার বিশেষ ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে নিয়ে নেয় এবং দম্ভ করে ঘোষণা দেয় যে-

"আপনি আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে ওত পেতে বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" (সূরা আল আ'রাফ-১৬-১৭)

এভাবে শয়তান বনী আদমের পিছু নেয়। আর বিদ্রোহে উসকানি দিতে থাকে। প্রত্যেক নবী-রাসূলের যুগে একদল লোক বিদ্রোহী শয়তানের বাহিনীতে যোগ দিয়ে নবী-রাসূলদের শিক্ষার সমালোচনা ও বিরোধিতা করতে থাকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- "ওদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসেননি, যাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকেনি। এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিই। ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে।" (সূরা হিজর-১১-১৩)

ইসলাম বিদ্বেষ :

এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবমাননা এবং তাঁর আনীত সত্য ধর্ম ইসলামের বিরোধিতা শুরু হয়। অথচ ওই যুগের ইহুদীরা শেষ যমানায় এমন একজন নবী আগমনের অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে ওই নবীর উসিলা দিয়ে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কোরাইশ বংশে যখন শেষ নবীর আবির্ভাব হলো, রুটিরুজি বন্ধ হওয়ার ভয়ে ইহুদীরা তার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে অভিশপ্ত হলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- " যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে বিজয় কামনা করত।" (সূরা আল বাকারা-৮৯)

মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশগণ যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল-আমিন বলে উপাধি দিয়ে রেখেছিল, ইসলামের একত্ববাদের বাণী প্রচারের সাথে সাথে দেবদেবীর মান বাঁচাতে তারাই বিরোধিতায় লিপ্ত হলো। চলতে থাকল উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর হত্যার নাপাক ষড়যন্ত্র। নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এমন কঠিন নির্যাতন আর নিপীড়ন সইতে হলো, যা ইতিপূর্বে কোনো নবী-রাসূলের সইতে হয়নি। নবীজি (সা.) বলেন- "আল্লাহর পথে আমাকে এমন সব কষ্ট দেয়া হয়, যা ইতিপূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি।" (বোখারী)

নির্যাতনের মুখে অবশেষে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে আল্লাহর নির্দেশে মদীনা শরীফে হিজরত করেন। সেখানে গিয়ে তিনি মুনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। আব্দুল্লাহ ছিল মদীনার অতি প্রতিপত্তিশালী এক নেতা। নবীজি (সা.) মদীনায় আগমনের পূর্বে আব্দুল্লাহকে রাজসিংহাসনে বসানোর প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। তার জন্য একটি রাজমুকুটও ক্রয় করা হয়েছিল। কিন্তু নবীজি (সা.)-এর আগমনে সব হিসাব পাল্টে যায়। আব্দুল্লাহর ক্ষমতার সাধ অধরাই রয়ে যায়। ইতিমধ্যে নবীজি (সা.) মদীনা রাষ্ট্র কায়েম করেন আর আব্দুল্লাহ বিন উবাই ক্ষমতা হারানোর ক্ষোভে দাহ হতে থাকে। বাকি জীবন সে রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতায় কাটিয়ে দেয়।

ইসলাম বিদ্বেষের করুণ পরিণতি :

ইহুদী-খ্রিস্টান, পৌত্তলিক আর মুনাফেকদের চরম বিরোধিতার মধ্যে নবীজি (সা.) ইসলামের প্রচারকাজ চালিয়ে যেতে থাকেন আর ক্ষণে ক্ষণে আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে থাকেন। রাসূল বিদ্বেষে সর্বাধিক অগ্রগামীদের অন্যতম ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, হারিস ইবনে উতাইল এবং আস ইবনে ওয়ায়েল। নবীজি (সা.) এদের উৎপীড়নে হতোদ্যম হয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে দমনের ঘোষণা আসে। ইরশাদ হচ্ছে- "বিদ্রূপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট।" (সূরা হিজর-৯৫)

শুরু হয়ে যায় পাকড়াও। তাদের শায়েস্তা করতে আগমন করেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। নবীজি (সা.) একে একে তাদের সকলকে চিনিয়ে দেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) ওয়ালিদের হাতের শিরার দিকে ইশারা করলেন। নবীজি (সা.) বললেন, আপনি তো তাকে কিছুই করলেন না। জিবরাঈল (আ.) বললেন যথেষ্ট করে দিয়েছি। অতঃপর আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিবের চোখের দিকে ইশারা করলে, নবীজি (সা.) বললেন, আপনি তো কিছুই করেননি। তিনি বললেন, যথেষ্ট করে দিয়েছি। এরপর আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের মাথার দিকে ইশারা করলেন। এবারও নবীজি (সা.) বললেন, আপনি তো কিছুই করলেন না। জিবরাঈল (আ.) একই উত্তর দিলেন। অতঃপর হারিসের পেটের দিকে ইশারা করলে নবীজি (সা.)-এর সাথে একই ধরনের বাক্য বিনিময় হলো। সব শেষে আস ইবনে ওয়ায়েলের পায়ের পাতার দিকে ইশারা করলেন। নবীজি (সা.) বললেন, আপনি তো তার কিছুই করেননি। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনার পক্ষ থেকে এদের সকলের কাজ চুকিয়ে দিয়েছি।

কিছুদিনের মধ্যে এদের ওপর আল্লাহর আযাব প্রকাশ পেতে লাগল। খুযায়া গোত্রের এক লোক তীরে পালক সংযোগ করছিল, ওয়ালিদ তার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি তীর তার হাতের রক্তবাহী শিরায় এসে বিদ্ধ হয়। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব চোখে কাঁটার মতো কিছু বিদ্ধ হচ্ছে অনুভব করতে লাগল। সে যন্ত্রণায় ছটফট করে লোকদের বলত, দেখ তো আমার চোখে কী বিদ্ধ হয়েছে। লোকেরা দেখে বলত, কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। একপর্যায়ে তার চোখ অন্ধ হয়ে যায়। আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের মাথায় ভয়ঙ্কর ফোঁড়া উঠে যন্ত্রণায় মৃত্যু হয়। হারেসের পেটে হলুদ পানি জমতে থাকে, ফলে তার মুখ দিয়ে মল নির্গত হতে আরম্ভ করে। ধুঁকে ধুঁকে সেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর আস ইবনে ওয়ায়েল একদা তায়েফ গমন করলে সেথায় তার পায়ের তালুর নরম স্থানে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে পায়ে পচন ধরে এবং তার মৃত্যুর কারণ হয়। (তাফসীরে রুহুল মা'আনী ১৪/১২৭)

আল্লাহর রাসূলের সাথে বেয়াদবির এই

ছিল পার্থিব জগতের লঘু সাজা আর পরকালের ভয়াবহ সাজা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। যে বা যারাই রাসূল (সা.)-এর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে তাদের পরিণতিও এমনই হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- "যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব, যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্য স্থান। (সূরা আন নিসা-১১৫)

কা'ব ইবনে আশরাফের সাজা :

ইহুদী গোত্র বনু নযীরে কা'ব ইবনে আশরাফ নামক একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিল। নামজাদা কবি হওয়ার কারণে সকল গোত্রের ওপর তার বিশেষ প্রভাব ছিল। তদুপরি সে অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়ায় ইহুদীদের মাঝে সে নেতা হিসেবে পরিচিত ছিল। ইহুদী ধর্মযাজকদিগকে ভাতা ও বৃত্তি দান করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য করত। বদর যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় হলে কা'ব খুব ব্যথিত হয়। সমবেদনা জানাতে মদীনা থেকে ছুটে যায় সুদূর মক্কায়। সেখানে গিয়ে নানাবিধ কবিতা ও শোকগাথা রচনা করে নিহত সরদারদের প্রতিশোধ নিতে কুরাইশদের উত্তেজিত করে তোলে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান চালানোর জন্য সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসে।

তার কবিতার মাধ্যমে কুরাইশগণ নব উৎসাহে জেগে উঠল। ঠিক যেভাবে বর্তমান যুগে মিডিয়া, ফেসবুক আর বিভিন্ন ব্লগের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হয়। তার কবিতা আর রচনা সে কাজই করল।

একবার কা'ব নবীভক্ত সেজে রাসূল (সা.) কে তার নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন, ফলে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। কা'বের এ সকল কুকর্মের দরুন সাহাবীগণ (রা.) তার ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। মদীনার আদালত থেকে নবী করীম (সা.) কা'বের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন। সাজা কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পণ করা হলো হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা.)-এর নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি ক্ষুদ্র দলের ওপর। তারা কৌশলে কা'বের সুরক্ষিত গৃহে প্রবেশ করে রাত্রিবেলা তাকে কতল করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। যার বিস্তারিত বিবরণ বোখারী শরীফসহ বহু হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

ধর্মত্যাগের উদ্ভব :

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের তেইশ বছর জিন্দেগীর একেবারে শেষ দিকে এসে যে ফেতনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা হচ্ছে ধর্মত্যাগের ফেতনা। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা স্বপ্নে দেখেন যে, ভূপৃষ্ঠের সকল ধনভাণ্ডার তাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর তাঁর দুই হস্ত মুবারকে দুটি স্বর্ণের বালা রেখে দেয়া হয়েছে। স্বর্ণের গহনা যেহেতু পুরুষদের জন্য হারাম, তাই এতে তিনি খুব বিব্রতবোধ করছিলেন এবং পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশী নির্দেশ আসে এ দুটিকে ফুতকার মারার। নবীজি (সা.) বলেন, ফুতকার মারার সাথে সাথে বালা দুটি উড়ে চলে গেল। আমি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বললাম যে, দুজন মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে। আর এরা হচ্ছে আসওয়াদ এবং মুসাইলামা। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে যারা ধর্মত্যাগী হয়েছিল। (বোখারী শরীফ ২/১০৪১) মুহাদ্দিসগণ লিখেন, সামান্য ফুতকারে বালা দুটি উড়ে যাওয়ার মাঝে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। (ক) ধর্মত্যাগের ফেতনা সামান্য চেষ্টার দ্বারাই দমন সম্ভব। (খ) এ ধরনের ফেতনার শেকড় দুর্বল এবং অস্থিতিশীল হবে।

সর্বপ্রথম মুসায়লামা কাযযাব মহানবী (সা.)-এর সাথে নবুওয়াতের অংশীদারত্বের দাবি করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌঁছে যে, সে মহানবী (সা.)-এর দূতকে আপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতকে হুমকি দিয়ে বলে, যদি দূতদেরকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী না হতো, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। মুসায়লামা স্বীয় দাবিতে মিথ্যাবাদী ছিল। নবীজি (সা.) তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন।

এমনিভাবে ইয়ামানে মুযজাজ গোত্রের সরদার আসওয়াদ আনাসী নবুওয়াতে দাবি করে বসে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে দমন করার জন্য ইয়ামানের গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাতে তাকে হত্যা করা হয়। তার আগের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) ওফাত পান।

বনী আসাদ গোত্রেও এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটে। তাদের সরদার তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদ নবুওয়াত দাবি করে বসে।

উপরোক্ত তিনটি গোত্র রাসূল (সা.)-এর রোগশয্যায় থাকা অবস্থায়ই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর বিভিন্ন স্থানে ধর্মতাগীদের উদ্ভব ঘটে। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিককে ইসলামী আইন অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে। হুজুর (সা.)-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাঁধে

অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিয়োগ ব্যথায় মুহ্যমান, অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের দুঃসংবাদ। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবু বকরের ওপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোনো পাহাড়ের ওপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। সাহাবায়ে কেরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এই নবীন ইসলামী দেশটির ওপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সিদ্দিকের অন্তরকে এ জিহাদের জন্য পাথরের মতো মজবুত করে দিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জিহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারও মনে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন :

"যারা মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব।"

এ কথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরি করে ফেললেন। সাহাবায়ে কেরামের একটি দল খলিফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরি হয়ে গেলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হলো। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে ছিলে। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহশী (রা.)-এর হাতে নিহত হলো এবং তার দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদের মুকাবিলায় ও হযরত খালেদই (রা.) গমন করলেন। তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাহিরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্দিকী খেলাফতের প্রথম মাসে বরিউল আউয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আনাছীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয় বার্তা, যা চরম সঙ্কটের মুহূর্তে খলিফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য যাকাত অস্বীকারকারীদের মোকাবিলায় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রণাঙ্গনে সাহাবায়ে কেরামকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন।

বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী :

ধর্মত্যাগের যে ফেতনার মোকাবিলা ইসলামের প্রথম খলিফা করেছিলেন সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে পূর্ব থেকেই ভবিষ্যৎদ্বাণী করা হয়েছিল। ইরশাদ হচ্ছে, "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে, স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।" (সূরা আল মায়েদাহ-৫৪)

এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগের সংবাদ বহন করছে এবং তা দমনের জন্য একদল খোদা প্রেমিক বান্দাগণ ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ারও সুসংবাদ দিচ্ছে। উপরন্তু এখানে পরবর্তী আয়াতে ওই খোদায়ী বাহিনীর বিজয়ের ঘোষণাও দিয়ে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- আর যারা আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.) এবং বিশ্ববাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। (সূরা আল মায়েদাহ-৫৬)

আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার মোকাবিলায় আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তারা হলেন হযরত আবু বকর (রা.) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরাম। এ দলের যেসব গুণ উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা সবই হযরত আবু বকর (রা.) ও সাহাবায়ে কেরামের (রা.) মাঝে বিদ্যমান ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করবে তাঁরাও এ আয়াতের সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের মাঝেও ওই গুণাবলি থাকবে।

অর্থাৎ-আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে

ভালোবাসবেন। তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসবেন। তারা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাফেরদের বেলায় কঠোর হবে। তারা আল্লাহ পথে জিহাদে কোনো ভর্ৎসনাকারীর পরোয়া করবে না।

ধর্মত্যাগের সাজা :

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বপ্রথম ধর্মত্যাগের ফেতনার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে করুণ এক অধ্যায় হিসেবে যা চিহ্নিত হয়ে থাকে। সবেমাত্র নবীজি (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আর একদল দুষ্কৃতকারী ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে সূচিত হয় এই ফেতনা। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাদেরকে বোঝানোর সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন। খলিফার পাঠানো লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে বাধ্য হন। (বোখারী শরীফ ২/১০২৩)

হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত আমলে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী একদল লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে বিভিন্ন আজগুবী ধরনের আক্বীদা বিশ্বাস প্রচারে লিপ্ত হয়। এতে মুসলমানদের মাঝে বিরাট ফেতনা সৃষ্টি হয়। খলিফা হযরত আলী (রা.) প্রথমে তাদেরকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এরপর গ্রেফতার করে তাওবা করার আহ্বান জানান। কিন্তু কিছুতেই ওরা অনুতপ্ত হলো না এবং তাওবায় সম্মত হচ্ছিল না। অবশেষে তাদের জন্য হযরত আলী (রা.) কঠোর সাজা ঘোষণা করেন। বিশাল গর্ত খনন করে তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয় এবং ধর্মত্যাগীদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। এই সংবাদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) শুনে বললেন, আমি হলে তাদেরকে আগুনে জ্বালাতাম না, কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আযাব দিয়ে কাউকে সাজা দিওনা। বরং আমি তাদেরকে কতল করে দিতাম, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করবে তোমরা তাকে কতল করে দাও।" (বোখারী, আবু দাউদ)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল এবং আবু মূসা আশয়ারী (রা.) কে নবীজি (সা.) ইয়ামানের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। উভয়ে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করে পরামর্শ করে কাজ চালাতেন। একবার হযরত মুয়ায (রা.) হযরত আবু মূসা আশয়ারীর (রা.) সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি খুব আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানালেন। এবং বসতে বললেন। পাশেই একজন লোককে বেঁধে রাখা হয়েছিল। হযরত মুয়ায (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ওর কী হয়েছে? হযরত আবু মূসা (রা.) বললেন, লোকটি ইহুদী থেকে মুসলমান হয়েছিল। অতঃপর ধর্মত্যাগ করে পুনরায় ইহুদী হয়ে গেছে। আপনি বসুন। হযরত মুয়ায (রা.) বললেন, আল্লাহর বিধান মতে তাকে কতল না করা পর্যন্ত আমি বসব না, বসব না, কিছুতেই বসব না। অতপর নির্দেশ জারি হলো এবং তাকে কতল করে দেয়া হলো। (বোখারী শরীফ ২/১০২৩)

নেক সুরতে ধর্মত্যাগ :

হাদীস শরীফের ভবিষ্যৎদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যামানায় এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা যুবক বয়সের হবে। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট ঘাটতি থাকবে। কথায় কথায় তারা হাদীসের বাণী আওড়াবে। কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করবে এবং ভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাস প্রমাণের চেষ্টা করবে। বাহ্যিকভাবে তারা খুব ইবাদত-বন্দেগীরত হবে। লোকেরা তাদের নামায-রোজার সামনে নিজেদের নামায-রোজাকে তুচ্ছ মনে করবে। যেন তাদের নামাযই কুরআন-হাদীস মতে সঠিক হচ্ছে আর বাকিদেরটা হচ্ছে না। তবে কুরআন-হাদীসের বুলি শুধু তাদের মুখেই থাকবে অন্তরে গ্রথিত হবে না। মানুষকে গোমরাহ করার জন্যই মূলত কুরআ- হাদীসের দোহাই দেবে। আর বাস্তবে কুরআন-হাদীসবিরোধী আক্বীদা পোষণ করবে এবং কুরআন-হাদীস মোতাবেক জীবন যাপন করবে না। ফলে এরা দ্বীন থেকে ইসলাম থেকে নিজেদের অজান্তেই ছিটকে পড়বে।

নবীজি (সা.) বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তুলতে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, যেভাবে দ্রুতগামী তীর শিকারকে এফোড়-ওফোড় করে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে তাতে রক্তের কোনো চিহ্ন থাকে না। তীরটিকে উঠিয়ে ওলট-পালট করে তীরের নখ, কঞ্চি এবং পর দেখা হয় ও সেখানে রক্তের কোনো দাগ না পেয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

তদ্রূপ ওই দলটির ঈমানের অবস্থাও সন্দেহজনক হবে। খোলাফায়ে রাশেদা, সাহাবায়ে কেরামের পুতপবিত্র কাফেলা আর ওলামায়ে কেরামের আনুগত্য পরিহার করে কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যার অনুসরণ করতে করতে ওই দলটি ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যে, তারা বুঝতেও পারবে না। একসময় তাদের মাঝে ইসলামের কোনো কিছুই আর বাকি থাকবে না।

নবীজি (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন যে, এমন লোকের সাক্ষাৎ পেলে তোমরা তাদেরকে কতল করে দেবে। ওদের কতলকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে বিশাল প্রতিদান থাকবে। (বোখারী হা. ৬৯৩০-৬৯৩২, ইবনে মাজাহ হা. ১৭৬)

হাদীসের ভবিষ্যৎদ্বাণী অনুযায়ী সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.)-এর যুগে এমন একটি দলের বহিঃপ্রকাশ হয়। ইতিহাসে যারা খারেজি নামে প্রসিদ্ধ। হযরত আলী (রা.) তাদের বোঝানোর অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন, তারা ফিরে তো এলই না উল্টো পঁচিশ হাজারের বাহিনী নিয়ে খলিফার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো। হযরত আলী (রা.) ঘোষণা করলেন এখনো সময় আছে যারা ফিরে আসবে তাদের ক্ষমা করা হবে। সে মতে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক লোক সাধারণ ক্ষমায় সুযোগ গ্রহণ করে ফিরে এল। বাকি দশ-বারো হাজার লোক লড়াই করতে করতে প্রাণ হারাল। হযরত আলী (রা.) তাদের সকলকে কতল করে দিলেন।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন যে, খারেজী ফিতনা বিভিন্ন যুগে মাথাচাড়া দেবে, এটা নির্দিষ্ট কোনো যুগের বিষয় নয়। আর বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত লক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন যুগে একদল লোক আত্মপ্রকাশ করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। বর্তমান যুগেও মসজিদে মসজিদে একদল যুবকের দেখা মেলে, যারা মুখে হাদীসের কথা বলে তবে বাস্তব জীবনে এর নমুনা দেখা যায় না। তাদের নামায দেখলে মনে হয় মসজিদের বাকি মুসল্লিদের কারো নামাযই হাদীস মতে শুদ্ধ হয়নি। এমনকি ইমাম সাহেবেরটাও নয়? এরা চার খলিফা, সাহাবায়ে কেরাম বা আলেম-ওলামা কারো কথাই মানে না।

চার্চের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র :

মুসলমানদেরকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বানানোর জন্য বর্তমান বিশ্বের দেশে দেশে খ্রিস্টান মিশনারি বিভিন্ন উপায়ে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল চার্চের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি কলিন চেক ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর এক সাক্ষাৎকারে ভয়াবহ সব ষড়যন্ত্রের কথা বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ করে দেয়। তার স্বীকারোক্তিতে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। ইউরোপের দেশগুলোতে আইন করে প্রত্যেক কর্মজীবীর বেতনের পাঁচ শতাংশ বাধ্যতামূলক কেটে রাখা হয়। অধিকাংশ ইসলামী ও আফ্রিকান দেশগুলোতে ইউরোপিয়ান পুঁজি বিনিয়োগের যে রেওয়াজ আছে তা মূলত চার্চের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। এসব বিনিয়োগের সমুদয় মুনাফা চার্চের স্বার্থে খরচ করা হয়। মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করার জন্য চার্চ ফান্ড থেকে বৃষ্টির মতো খরচ করা হয়। বিশ্বব্যাপী এনজিওর জাল বিছিয়ে তারা স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর রয়েছে। একেক শ্রেণীকে ধর্মহীন বানাবার কৌশল একেক রকম হয়ে থাকে। যেমন এক ব্যক্তি গোড়া থেকেই ধর্মহীন। ফলে তাকে খুব সহজেই অর্থ, বাড়ি ও নারীর প্রলোভনে খ্রিস্টান বানানো হয়। পক্ষান্তরে একজন দ্বীনদার ব্যক্তিকে ধরার জন্য খ্রিস্টান কর্মীদের সামনে দুটি অপশন থাকে। এক. কোনোভাবে তাকে মুরতাদ বানানো। দুই, তা সম্ভব না হলে তার ঈমানকে দুর্বল করে দেয়া। এমন কোনো উপায় ও পন্থা অবলম্বন করা যেন সে নানা ধরনের পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। এক কথায় মুসলমানদের মুরতাদ কিংবা গুনাহগার বানানোর জন্য খ্রিস্টান প্রচারকর্মীরা খুবই দীর্ঘ এবং ধীরগতিসম্পন্ন পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়। এ ক্ষেত্রে তাদের কৌশলের মধ্যে যেমন লোভ-লালসার নানা উপায়-উপকরণ থাকে, তেমনি থাকে রিপু ও স্বপ্নের হাজার প্রদীপ। তাদের এ টার্গেটে কোনো দেশের সরকারের পক্ষ থেকে বাধা এলে চার্চের পক্ষ থেকে নিজ দেশের সরকারের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করা হয়। কারণ চার্চের শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার অঙ্গীকার ইউরোপিয়ান দেশগুলোর রয়েছে। কখনো বা চার্চের পক্ষ থেকে দেয়া সে দেশের জনগণের সাহায্য-সহযোগিতার লাগাম টেনে ধরা হয়। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান সরকারই চার্চের সাহায্য এবং সেবা ছাড়া চলতে অক্ষম। এতেও কাজ না হলে সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে সে দেশের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং দেশের ভেতর নানা রকমের দাঙ্গা এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দেয়ার পেছনে সর্বশক্তি ব্যয় করা হয়।

এ সকল ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশকারী এমন এক ব্যক্তি, যে খোদ একসময় ওই সব চার্চের মাধ্যমে এসকল তৎপরতা চালিয়েছেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাকে হেদায়েত দান করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বিগত দিনের পাপের কাফফারা দিতে গিয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এযাবৎ লাখ লাখ লোক তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ সুদানের চার্চগুলো থেকে বেরিয়ে আসা আড়াই হাজার পদস্থ কর্মকর্তাও এই নওমুসলিম কাফেলায় রয়েছেন।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের দুর্দশার কারণ তার মতে দুটি। এক, তারা ব্যক্তিজীবনে ধর্ম থেকে অনেক দূরে। দুই. রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও তারা নিজেদের ধর্মকে উপেক্ষা করে চলছে। মুসলমান দেশগুলোর জনগণ যদি ইসলামের বিধিবিধানকে অনুসরণ করে চলত, তাদের ব্যক্তিজীবনে ইসলামকে গুরুত্ব দিত, আর শাসকগণ যদি রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামকে নির্দেশিকা হিসেবে বরণ করে নিত তাহলে তারা তাদের অতীতের শান-শওকত ঐতিহ্য মর্যাদা এবং হারানো গৌরব সবই ফিরে পেত। (ঈমানজাগানিয়া সাক্ষাৎকার ৪/৪০৮)

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১০

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অলংকারবিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসায়িল :

যেহেতু উপর্যুক্ত মাসায়িলের সাথে বাঈ ছরফের সম্পর্ক গভীর তাই উক্ত মাসআলাগুলোর আলোচনা এ ক্ষেত্রে খুব জরুরি। তবে মাসআলাগুলোর আলোচনার পূর্বে ভূমিকাসূলভ কিছু মূলনীতি উপস্থাপন অপরিহার্য। যাতে উক্ত মাসআলাগুলো সহজেই বোধগম্য হয়।

মূলনীতি -১ যখন লেনদেনের উভয় দিকে স্বর্ণ বা রৌপ্য হবে তখন লেনদেন হাতে হাতে হওয়া এবং বিনিময়দ্বয়ের পরিমাণ সমান হওয়া জরুরি। তবে যদি একটা বিনিময় স্বর্ণ এবং অপরটা রৌপ্য হয় তাহলে উভয়ের পরিমাণে কমবেশি হতে পারে। কিন্তু তখনো হাতে হাতে হওয়া অপরিহার্য।

যথা মহানবী (সা.)-এর হাদীস-

الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدابيد-

(كنز العمال رقم الحديث ٤٦٦٩)

অর্থাৎ, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। গমকে গমের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। লবণকে লবণের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। জবকে জবের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। কিন্তু যে ব্যক্তি সমান সমানের পরিবর্তে অতিরিক্তসহ লেনদেন করবে সে সুদের মধ্যে লিপ্ত হবে। তবে স্বর্ণকে রৌপ্যের বিনিময়ে যেকোনোভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। কিন্তু শর্ত হলো, তখনো বিনিময়দ্বয়ের লেনদেন হাতে হাতে হতে হবে।

মূলনীতি-২ যখন স্বর্ণকে স্বর্ণের সাথে বা রৌপ্যকে রৌপ্যের সাথে লেনদেন করা হবে, তখন বিনিময়দ্বয়ের পরিমাণ সমান হওয়া ওয়াজিব যদিও একদিকে পিওর ও খাঁটি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অপরদিকে অল্প স্বল্প খাদ মিশ্রিত স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকে। যথা-

عن الشعبى ان عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيانا دراهم دون وزنها فنهاه عمر عن ذلك وقال اوقد عليها حتى يذهب مافيها من حديد او نحاس وتخلص ثم بع الفضة بوزنها (اعلاء السنن ٢٩٨/٤١)

হযরত ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বাইতুল মালের নিম্নমানের খাদ মিশ্রিত দেরহামকে উন্নতমানের দেরহামের বিনিময়ে কমবেশ করে বিক্রি করলেন। হযরত ওমর (রা.) তা অবগত হওয়ার পর তাকে এ রকম লেনদেন করা থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন যে, খাদ মিশ্রিত নিম্নমানের দিরহামগুলো আগুনে গলিয়ে মিশ্রিত লোহা-তাম্র ইত্যাদি ধাতব পৃথক করে পিওর ও খাঁটি রৌপ্যগুলোকে সমান সমান রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করো।

তদ্রুপ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহ.) উল্লেখ করেন,

عن بن سيرين قال خطب عمر بن الخطاب فقال الا ان الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار عينا بعين سواء بسواء مثلا بمثل فقال له عبد الرحمن بن عوف تزيف علينا اوراقنا فنعطى الخبيث ونأخذ الطيب فقال عمر لا ولكن ابتع بها عرضا فاذا قبضته وكان لك فبعه واهضم ماشئت وخذأى نقد شئت (المرجع السابق)

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহ.) বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) তার প্রদত্ত খুতবায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন সাবধান! তোমরা দিরহামকে দিরহামের বিনিময়ে এবং দিনারকে দিনারের বিনিময়ে হাতে হাতে এবং সমান সমান বিক্রি করো। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাদের রৌপ্য খাদ মিশ্রিত হওয়ায় আমরা কম মূল্যে খাদ মিশ্রিত রৌপ্য বিক্রি করে এর বিনিময়ে উন্নত ও পিওর রৌপ্য ক্রয় করে থাকি। হযরত ওমর (রা.) প্রতিউত্তরে বললেন, না, এটা বৈধ হবে না, তবে খাদ মিশ্রিত রৌপ্যের বিনিময়ে অন্য কোনো পণ্য ক্রয় করো এবং তা যখন তোমরা কব্জ করবে তখন তা তোমাদের মালিকানাধীন হয়ে যাবে এরপর তা বিক্রি করো।

মূলনীতি-৩ বর্তমান যুগে টাকা ধাতব মুদ্রার মতোই। এই মুদ্রা ২৫ পয়সা এবং ৫০ পয়সার কয়েনের মতো। তাই দশ টাকার কাগজের নোট ধাতব মুদ্রার বিকল্প। ১৯৪৭ সালের পূর্বে রৌপ্যের মুদ্রার প্রচলন ছিল আমাদের দেশেও। তবে বর্তমান সময়ে কাগজের নোটের সাথে স্বর্ণ বা রৌপ্যের কোনো সম্পর্ক নেই, তাই এই মুদ্রার বিধান তাম্রের পয়সার বিধানের মতো হবে। সুতরাং

টাকা যখন রৌপ্যের ছিল তখন তার বিধানও ছিল রৌপ্যের বিধানের মতো বর্তমানে যেহেতু তাম্রের মতো তাই তার বিধান ও ভিন্ন হবে।

মূলনীতি-৪ স্বর্ণ বা রৌপ্যের মুদ্রার বিনিময়ে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। তবে কেনাকাটার সময় একপক্ষীয় কব্জ জরুরি।

যথা-

وفى شرح الطحطاوى لواشترى مأة فلس بدرهم وقبض الفلوس او الدراهم ثم افترقا جاز البيع لانهما افترقا عن عين بدين (فتح القدير ٦/٢٧٨)

শরহে তাহাবীতে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ এক দিরহামের বিনিময়ে একশ পয়সা ক্রয় করে এবং পয়সা বা দিরহামের ওপর কব্জ করে। এরপর ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হয়ে যায় তাহলে উক্ত লেনদেন বৈধ হবে। কেননা এতে, দাইন তথা ঋণের পরিবর্তে আইন তথা পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় করে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পৃথক হয়েছে।

আরো উল্লেখ আছে যে,

سئل الحانوتى عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فاجاب بانه يجوز اذا قبض احد البدلين لما فى البزازية۔

আল্লামা হানূতী (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, পয়সার বিনিময়ে স্বর্ণকে বাকিতে বিক্রি করা বৈধ হবে কি না? তিনি বললেন বৈধ হবে। তবে শর্ত হলো যে, বিনিময়দ্বয়ের মধ্য থেকে যেকোনো একটার ওপর কব্জ করা জরুরি কেননা ফাতাওয়া বাজাযিয়াতে উল্লেখ আছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি একশ পয়সা এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে যেকোনো এক পক্ষের কব্জ যথেষ্ট। তিনি আরো বলেন, তদ্রূপ, যদি পয়সার বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে বিক্রি করা হয়।

আল্লামা ছারাখসী (রহ.)-এর ঝোঁকও উপর্যুক্ত মতের দিকে। যথা তিনি বলেন,

واذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فا البيع جائز لان الفلوس الرائجة ثمن كالنقود وقد بينا ان حكم العقد فى الثمن وجوبها ووجودها معا ولا يشترط قيامها فى ملك بائعها لصحة العقد كما لا يشترط ذلك فى الدراهم والدنانير (المبسوط للسرخسى ٤/٢٤)

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি দিরহামের বিনিময়ে পয়সা ক্রয় করে এবং ছমন তথা দিরহাম পরিশোধ করে এবং পয়সা বিক্রেতার নিকট অনুপস্থিত ও থাকে তা সত্ত্বেও উক্ত লেনদেন বৈধ হবে। কেননা প্রচলিত পয়সা নূকুদ তথা দিরহাম দিনারের মতো ছমন। তিনি বলেন, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ছমনের মধ্যে আকদের হুকুম হলো যে শুধুমাত্র আকদটা ওয়াজিব হওয়া এবং মজুদ তথা তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা। আকদের সময় ছমনটা বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকা আকদ যথার্থ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। যেমনটা দিরহাম ও দিনারের ক্ষেত্রেও তা শর্ত নয়।

যেহেতু টাকা ও পয়সার হুকুমে তাই উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয় টাকার বিনিময়ে বৈধ। তবে শর্ত হলো, যে এক পক্ষ থেকে মালের কব্জ করা জরুরি ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বেই। বিনিময়দ্বয় যদি বাকি হয় তাহলে উক্ত লেনদেন বৈধ হবে না। বাকির মেয়াদ অল্প সময় হলেও। কেননা এমতাবস্থায় তা বাঈউল কালী বিল কালী তথা ঋণের বিনিময়ে ঋণের ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুমের আওতাভুক্ত হবে। অথচ এ ব্যাপারে মহানবী (সা.) নিষেধ করেছেন।

عن ابن عمر رضى الله عنه ان النبى ﷺ نهى عن بيع الكالى بالكالى (الدراية فى تخريج احاديث الهداية ١/١٥٧)

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বাকিকে বাকির বিনিময়ে বিক্রি করা থেকে নিষেধ করেছেন।

স্বর্ণের অলংকার স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্যের অলংকার রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান :

স্বর্ণের অলংকার স্বর্ণের বিনিময়ে এবং রৌপ্যের অলংকার রৌপ্যের বিনিময়ে কমবেশ করে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। যথা-

عن ابى رافع قال مربى عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال اصنع لى او ضاحا لصبى لنا قلت يا امير المؤمنين عندى اوضاح معمولة فان شئت اخذت الورق واخذت الاوضاح فقال عمر مثلا بمثل فقلت نعم فوضع الورق فى كفة الميزان والاوضاح فى الكفة الاخرى فلما استوى الميزان اخذ باحدى يديه واعطى بالاخرى۔ (معانى الاثار)

অর্থাৎ হযরত আবু রাফে' (রা.) বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) আমার নিকট এলেন এবং বললেন আমার মেয়ের জন্য এক জোড়া নূপুর বানিয়ে দাও, আমি বললাম হে আমীরুল মুমিনীন বানানো নূপুর আছে যদি আপনি ভালো মনে করেন আপনার রৌপ্যগুলো আমি নিয়ে নেব আর আপনি নুপূর নিয়ে যান হযরত ওমর (রা.) বললেন বিনিময়দ্বয়ের ওজন যদি সমান হয় তাহলে আমি নিতে রাজি আছি, হযরত আবু রাফে' (রা.) বলেন, ঠিক আছে, অতঃপর হযরত ওমর (রা.) পাল্লার এক পাশে রৌপ্য রাখলেন অপর পাশে বানানো নুপূর রাখলেন। যখন পাল্লা সমান হলো তখন এক হাতে নুপূর নিলেন অপর হাতে রৌপ্যগুলো দিলেন।

আরো বর্ণিত আছে যে,

عن ابى رافع انه قال لعمر انى اصوغ الذهب فابيعه بوزنه واخذ عمالة يدى اجرا قال لا تبع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن والفضة بالفضة الا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا (اعلاء السنن

(১৪/২৮৭،২৮৮)

অর্থাৎ হযরত আবু রাফে' (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হযরত ওমর (রা.) কে বললেন আমি স্বর্ণের অলংকার বানাই এবং তা ওই পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করি এবং আমার মজুরিও গ্রহণ করি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে এবং রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না তবে সমান সমান বিক্রি করো অতিরিক্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো। তদ্রূপ আরো উল্লেখ আছে যে,

عن ابى رافع مولى رسول الله ﷺ قال احتجنافأخذت خلخال امرأتى فى السنة التى استخلف فيها ابو بكر فلقينى ابو بكر فقال ماهذا فقلت احتاج الحى الى نفقة فقال ان معى ورقا اريد بها فضة فدعا بالميزان فوضع الخلخالين فى كفة ووضع الورق فى كفة فشف الخلخالين نحوا من دانق فقرضه فقلت يا خليفة رسول الله هو لك حلا ل فقال يا ابا رافع انك ان احللته فان الله لا يحله سمعت رسول الله ﷺ يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن الزائد والمستزيد فى النار۔ (المرجع السابق)

অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর আযাদকৃত দাস হযরত আবু রাফে' (রা.) বলেন, যে বছর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামী দুনিয়ার খেলাফত লাভ করেন। ওই বছর আমার আর্থিক অভাব শুরু হয়। তখন আমি আমার স্ত্রীর পায়ের নূপুর নিলাম। পথে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমার হাতে কী? আমি প্রতিউত্তরে বললাম, আমার পরিবারের খরচের প্রয়োজনে নূপুরগুলো নিয়ে বেরিয়েছি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমার নিকট কিছু রৌপ্য মুদ্রা আছে যা দিয়ে আমি রৌপ্যের অলংকার নিতে চাই অতঃপর তিনি পাল্লা আনালেন এবং পাল্লার এক পাশে নূপুরদ্বয় রাখলেন অপর পাশে রৌপ্য রাখলেন, দেখা গেল, নূপুর রৌপ্যের তুলনায় এক দানেক তথা এক দিরহামের ৬ ভাগের ১ ভাগ সমপরিমাণ বেশি। এটা দেখে হযরত আবু বকর (রা.) পায়ের নূপুর থেকে ওই পরিমাণ ভেঙে ফেললেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা ওইটুকু অতিরিক্ত আপনার জন্য হালাল। প্রতিউত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হে আবু রাফে' যদিও তুমি তা আমার জন্য হালাল করে দিচ্ছ; কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তো হালাল করেননি। আমি মহানবী (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, স্বর্ণকে সমপরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে এবং রৌপ্যকে সমপরিমাণ রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করো। এতে অতিরিক্ত দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামী।

তদ্রূপ হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত-

عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاء ه صائغ فقال يا ابا عبد الرحمن انى اصوغ الذهب ثم ابيع الشئ من ذلك باكثر من وزنه فاستفضل من ذلك قدرعمل يدى فنهاه عبد الله بن عمر فجعل الصائغ يردد عليه المسئلة وعبد الله ينهاه حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابته يريد ان يركبها ثم قال عبد الله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم (المرجع السابق)

অর্থাৎ হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় এক স্বর্ণকার তার নিকট এসে বলল যে, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি অলংকার তৈরি করি এবং তা অতিরিক্ত স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করি। এবং অতিরিক্ত অংশটা আমার মজুরি হিসেবে নির্ধারণ করি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তা করা থেকে স্বর্ণকারকে নিষেধ করলেন। এমনকি উক্ত স্বর্ণকার তার কথা বারবার পেশ করতে ছিল অপরদিকে হযরত ইবনে উমর বারবার নিষেধ করতেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে তিনি মসজিদ পর্যন্ত অথবা তার বাহন পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং বললেন যে, এক দিনারকে এক দিনারের বিনিময়ে এবং এক দিরহামকে এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো কোনো এক পক্ষে অপর পক্ষের তুলনায় অতিরিক্ত ছাড়া। উক্ত শিক্ষা মহানবী (সা.) আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আমরা তোমাদেরকে দিচ্ছি।

তদ্রূপ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.) থেকে বর্ণিত-

عن عطاء بن يسار ان معاوية بن ابى سفيان باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها فقال له ابو الدرداء سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل فقال له معاوية ماارى بمثل هذا بأسا فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية انا اخبره من رسول الله ﷺ و يخبر نى عن رايه لا اساكنك بارض انت بها ثم قدم ابو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فكتب عمر الى معاوية الا يبيع مثل ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن۔ (المرجع السابق)

অর্থাৎ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত মুআবিয়া (রহ.) স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্র তার অতিরিক্ত পরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। তখন তাকে হযরত আবু দরদা (রা.) বললেন যে, আমি মহানবী (সা.) কে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করতে শুনেছি তবে উভয় পক্ষ সমপরিমাণের হলে বৈধ। প্রতিউত্তরে

হযরত মুআবিয়া (রা.) হযরত আবু দরদা (রা.) কে বললেন, আমি তো এতে কোনো প্রকারের অসুবিধা দেখি না। তখন হযরত আবু দরদা (রা.) বললেন, হযরত মুআবিয়াকে কে বোঝাবে? আমি তাকে রাসূলের বাণী শুনাই আর সে আমাকে তার ইজতিহাদ পেশ করে। এরপর হযরত আবু দরদা (রা.) রাগান্বিত হয়ে হযরত মুআবিয়াকে বললেন যে ভূখণ্ডে আপনি থাকবেন সেখানে আমি থাকব না। অতঃপর হযরত আবু দরদা (রা.) হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর নিকট মদিনা মুনাওয়ারাতে চলে আসেন এবং হযরত উমর (রা.) কে সম্পূর্ণ ঘটনা অবগত করলেন, তখন হযরত উমর (রা.) হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট চিঠি লিখলেন যে, উভয় পক্ষ সমপরিমাণ হওয়া ব্যতীত ওই ধরনের লেনদেন করা নিষেধ।

উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ :

উপরোল্লিখিত বর্ণনা ধারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বর্ণের তৈরি অলংকারকে অতিরিক্ত স্বর্ণের বিনিময়ে এবং রৌপ্যের তৈরি অলংকারকে অতিরিক্ত রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ অবৈধ। যদি ওই অতিরিক্ত অংশটাকে মজুরিও সাব্যস্ত করা হয়। তাই ওই পদ্ধতিতে মজুরি না নিয়ে বরং নগদ অর্থ নেওয়া যেতে পারে, যাকে আমাদের সমাজে বানি বলা হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক মাসআলা :

প্রশ্ন-১

কোনো স্বর্ণকার নিজ কারখানায় ২২K স্বর্ণ ব্যবহার করে কিছু অলংকার প্রস্তুত করল এবং অনেক ক্ষেত্রে পাথরও সংযোজন করল। অতঃপর দোকানদারের নিকট বিক্রির জন্য নিয়ে গেল। দোকানদার তা পছন্দ করে নিজের কাছে রেখে দিল এবং মজুরির টাকা তখন বা পরে পরিশোধ করে দিল এবং অলংকারের সমপরিমাণ পিওর ও খাঁটি স্বর্ণ কিছুদিন পরে একসাথে বা কিস্তিতে পরিশোধ করল। উক্ত লেনদেন বৈধ কি না?

উত্তর-১

যেসব অলংকারে কিছু কিছু খাদ মিশ্রিত থাকবে, যা পরিমাণে স্বর্ণের তুলনায় কম, ওই সব স্বর্ণের ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান পিওর স্বর্ণের বিধানের মতো, যা মূলনীতি-২-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এবং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু বিনিময়দ্বয় স্বর্ণ তাই বাকিতে বিক্রি বৈধ হবে না, যা মূলনীতি-১-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে তার বিকল্প পদ্ধতি হলো, দোকানদার স্বর্ণকার থেকে বাকিতে টাকার হিসাবে ক্রয় করবে, পরে মূল্য একসাথে বা কিস্তিতে পরিশোধ করবে। উক্ত পদ্ধতিতে বাকিতে লেনদেন বৈধ। কেননা এ ক্ষেত্রে একদিকে স্বর্ণ যা প্রাকৃতিক ছমন অপরদিকে টাকা যা প্রায়োগিক/প্রথাগত ছমন, যার লেনদেন বাঈ ছরফ নয়। তাই এতে বাকি বৈধ। তবে শর্ত হলো, অলংকারের ওপর কব্জ পাওয়া যেতে হবে। যাতে বাঈউল কালী বিল কালীর অন্তর্ভুক্ত না হয়।

প্রশ্ন-২

অনেক সময় স্বর্ণকাররা দোকানদার থেকে বিভিন্ন মডেলের অলংকারের অর্ডার নিয়ে নিজেদের স্বর্ণ দ্বারা তা প্রস্তুত করে দোকানে সরবরাহ করে, অথবা দোকানদারদের অর্ডার পেয়ে স্বর্ণকাররা নিজেদের স্বর্ণ দ্বারা অলংকার তৈরি করে দেয় পক্ষান্তরে দোকানদাররা ওই সময় অথবা স্বর্ণকারদের প্রয়োজন মতে মজুরি পরিশোধ করে এবং স্বর্ণকারের যখন প্রয়োজন হয় তখন দোকানদারের নিকট স্বর্ণের চাহিদা পেশ করে। দোকানদাররা চাহিদা মতে একসাথে বা কিস্তিতে তাদের প্রাপ্য স্বর্ণ পরিশোধ করে। উক্ত পদ্ধতি বৈধ কি না?

উত্তর-২

উক্ত পদ্ধতি অবৈধ। কেননা এটাও স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের ক্রয়-বিক্রয়। যাতে বাকি অবৈধ, যা বাঈ ছরফ হওয়ার কারণে নাযায়েজ। তবে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে পূর্বে ১ নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত পদ্ধতি প্রযোজ্য।

প্রশ্ন-৩

অনেকেই নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগ করে পরিপূর্ণ অলংকার তৈরির কাজ করে থাকে। ওই সব অলংকারের মধ্যে কিছুতে মুক্তা জড়ানো বা মুক্তাসাদৃশ্য পাথর জড়ানো থাকে। আবার কিছু অলংকার পাথরবিহীনও পাওয়া যায়। এ ধরনের বানানো অলংকার সাধারণত প্রস্তুতকারীরা দোকানদারদের নিকট বিক্রি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের লেনদেনের প্রচলিত নিয়ম হলো। সর্বপ্রকারের অলংকার একই পরিমাপে বিক্রি করা। অর্থাৎ মুক্তা জড়ানো, কৃত্রিম পাথর লাগানো বা পাথর ছাড়া অলংকার সবটি পিওর স্বর্ণের বিনিময়ে একই পরিমাপে বিক্রি করা। এ ক্ষেত্রে মজুরিও নির্ধারিত হয় ওজন হিসেবে। এ ধরনের বিক্রিতে সাধারণত বিক্রেতার পিওর স্বর্ণ ও মজুরি অর্জিত হয়। অর্থাৎ সর্বমোট ওজনের বিনিময়ে যে পিওর স্বর্ণ বিক্রেতার অর্জিত হয় তা অলংকারে অবস্থিত মিশ্রিত স্বর্ণ এবং তৈরির সময় যে পরিমাণ ক্ষয় হয়েছে এবং পাথর ইত্যাদিসহ সব কিছুর মূল্যের বিনিময়ে। এবং নগদ অর্থটা অর্জিত হয় মজুরি হিসেবে।

উল্লেখ্য, মজুরি নির্ধারিত হয় সাধারণত অলংকারে ব্যবহৃত পাথর উন্নত হওয়া না হওয়া এবং কাজের নৈপুণ্য ও সৌন্দর্যের ভিত্তিতে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে প্রশ্ন হলো- (ক) মিশ্রিত স্বর্ণের বিনিময়ে

পিওর স্বর্ণ নেওয়া বৈধ কি না? (খ) অলংকারে লাগানো পাথরের বিনিময়ে পিওর স্বর্ণ গ্রহণ করা বৈধ কি না?

উত্তর : যেহেতু স্বর্ণকার নিজের অলংকার দোকানদারের নিকট বিক্রি করছে দোকানদারের অর্ডারের তা'মীল নয়। সুতরাং মজুরির যে উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে বাস্তবে তা মজুরি নয় বরং অলংকারের মুল্যের একটা অংশবিশেষ। উদাহরণস্বরূপ, পাঁচ তোলা স্বর্ণের বানানো অলংকারের বিনিময়ে পাঁচ তোলা পিওর বা খাঁটি স্বর্ণ এবং ২০০০ টাকা মজুরি। এ ক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো, প্রস্তুতকৃত পাঁচ তোলাস্বর্ণালংকারের মূল্য পাঁচ তোলা খাঁটি স্বর্ণ ও ২০০০ টাকা।

যদি অলংকার সম্পূর্ণ রেডি, পাথরও লাগানো হয় এবং এতে মিশ্রিত স্বর্ণের পরিমাণ তিন তোলা হয় এবং লাগানো পাথরের পরিমাণ দুই তোলা হয় তাহলে শর্ত সাপেক্ষে ওই লেনদেন বৈধ হবে। শর্ত হলো, বিনিময়দ্বয়ের লেনদেন নগদ হতে হবে অথবা কমচে কম অলংকারের সাথে সাথে অলংকারে অবস্থিত মিশ্রিত স্বর্ণের সমপরিমাণ খাঁটি স্বর্ণের ওপর ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বেই কব্জ করতে হবে। কেননা অলংকারে অবস্থিত মিশ্রিত স্বর্ণের বিনিময়ে ওই পরিমাণ খাঁটি স্বর্ণ হয়ে যাবে এবং পাথরের বিনিময়ে অবশিষ্ট স্বর্ণ ও ২০০০ টাকা হয়ে যাবে। তবে অলংকার যদি খাঁটি স্বর্ণের হয় তাহলে উক্ত লেনদেন অবৈধ হবে এবং সুদি লেনদেন হয়ে যাবে। কেননা এমতাবস্থায় পাঁচ তোলা খাঁটি স্বর্ণের বিনিময়ে পাঁচ তোলা খাঁটি স্বর্ণ হবে এবং দুই হাজার টাকা বিনিময়বিহীন অতিরিক্ত হবে।

কারুকার্যকৃত অলংকারাদী স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় :

কিছু অলংকার এমনও থাকে, যেগুলোতে অতিরিক্ত কারুকার্য করা হয়। ওই সব অলংকারের লেনদেনের বেলায়ও পরিপূর্ণ ওজনের বিনিময়ে স্বর্ণ দেওয়া হয়। অর্থাৎ কারুকার্যের ওজন বাদ দেওয়া হয় না। এ পদ্ধতিও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। তবে শর্ত হলো, বিনিময়দ্বয়ের লেনদেন নগদ হতে হবে। বাকি না হতে হবে। ওই ধরনের অলংকারের ধার্য্য মূল্যের মধ্য থেকে কমপক্ষে এটুকু পরিমাণের স্বর্ণের ওপর কব্জ করতে হবে যে পরিমাণ খাদ মিশ্রিত স্বর্ণ অলংকারে অবস্থিত।

এ-সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক আরো কিছু মাসআলা :

১। দুই তোলা স্বর্ণ এবং এক তোলা রৌপ্যকে এক তোলা স্বর্ণ এবং পঞ্চাশ তোলা রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ। এবং এতে ধরে নেওয়া হবে যে, দুই তোলা স্বর্ণ পঞ্চাশ তোলা রৌপ্যের বিনিময়ে এবং এক তোলা রৌপ্য এক তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে। আর তা মনে করার অবকাশ থাকবে শুধুমাত্র ওই অবস্থায়, যদি ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপরোল্লিখিত কথা ছাড়া অন্য ধরনের বক্তব্য না দেয়। তবে তারা যদি বলে দুই তোলা স্বর্ণ এক তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে এবং এক তোলা রৌপ্য পঞ্চাশ তোলা রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা হলো। তাহলে তাদের এই পরিষ্কার বক্তব্যই ধর্তব্য হবে এবং এ ধরনের লেনদেন সুদি লেনদেন হবে। (সূনা চাঁদী আওর যেওয়ারাত কে ইসলামী আহকাম)

২। নিজের আংটি অন্যের আংটির সাথে বদলাবদলি :

এ-সংক্রান্ত কয়েকটি পদ্ধতি-

ক. যদি উভয়টা পাথর জড়ানো হয় তাহলে সর্বাবস্থায় উক্ত বিনিময় বৈধ। উভয়টার স্বর্ণ-রৌপ্য সমান হোক বা না হোক তবে উক্তাবস্থায় লেনদেন হাতে হাতে হবে।

খ. যদি উভয়টা পাথরবিহীন হয় তাহলে উভয়টার পরিমাপ সমান হওয়া জরুরি। কমবেশ হলে সুদ হবে।

গ. যদি উভয়টার মধ্য থেকে একটা পাথরবিশিষ্ট অপরটা সাদাসিদে হয়। এবং সাদাসিদের মধ্যে রৌপ্য যদি বেশি হয় তাহলে উক্ত লেনদেন বৈধ। অন্যথায় হারাম এবং সুদ হবে। তদ্রূপ যদি ওই সময় বিনিময়দ্বয়ের ওপর লেনদেন না হয় বরং একটা তাৎক্ষণিক এবং অপরটা বিলম্বিত হয় তা হলে উক্ত লেনদেন অবৈধ। (বেহেশতী জেওর)

৩। রৌপ্য জড়ানো দুপাট্টা অথবা টুপি দশ তোলা রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করল। তাহলে দেখতে হবে উক্ত দুপাট্টা বা টুপিতে কী পরিমাণ রৌপ্য জড়ানো। যদি এতে পাঁচ তোলা পরিমাণ রৌপ্যের কাজ করা থাকে তাহলে পাঁচ তোলা রৌপ্য তাৎক্ষণিক আদায় করতে হবে। অবশিষ্ট পাঁচ তোলা পরে আদায় করলেও চলবে।

কিছু নাজায়েয পদ্ধতির জায়েয বিকল্প :

১. অনুন্নত ও খাদ মিশ্রিত রৌপ্যের বিনিময়ে উন্নত রৌপ্য ক্রয় করা এবং উন্নত রৌপ্য ওজনে খাদ মিশ্রিত রৌপ্যের বরাবর হতে পারে না। তাই এর বিকল্প হলো। প্রথমে অনুন্নত রৌপ্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করবে এবং পরবর্তীতে ওই টাকার ওপর কব্জ করে তা দ্বারা উন্নত রৌপ্য ক্রয় করবে। (বেহেশতী জেওর)

২. যদি কোনো বস্তু এমন হয় যে এতে রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনো ধাতব জড়ানো। যথা, পাথর, চুমকি ইত্যাদি ওই ধরনের কোনো বস্তু রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করল তাহলে দেখতে হবে এতে রৌপ্যের পরিমাণ কতটুকু। নির্ধারিত মূল্যের রৌপ্যের সমান কম না বেশি। যদি মূল্যের রৌপ্যের তুলনায় ওই বস্তুতে জাড়নো রৌপ্যের পরিমাণ নিশ্চিত কম হয় তাহলে উক্ত লেনদেন বৈধ। যদি উভয়টার পরিমাণ সমান অথবা মূল্যের রৌপ্যের পরিমাণ জড়ানো

রৌপ্যের তুলনায় বেশি, তাহলে উক্ত লেনদেন সুদ। সুদ থেকে বাঁচার উপায় হলো, মূল্যের রৌপ্য বস্তুতে জড়ানো রৌপ্যের তুলনায় কম রাখা এবং এর সাথে অবশিষ্ট পরিমাণের টাকা শামিল করে নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ মূল্যের রৌপ্য পাঁচ তোলা বস্তুতে জড়ানো রৌপ্যের পরিমাণও পাঁচ তোলা যদি হয় তাহলে মূল্যের রৌপ্যের পরিমাণ পাঁচ তোলা থেকে কিছু কম করে নেওয়া যথা চার তোলা এবং এর সাথে এক তোলা সমপরিমাণের টাকা সংযুক্ত করে নেওয়া। তাহলে উক্ত লেনদেন বৈধ হবে।

৩. যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলংকার, পাত্র স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে। এবং ওই সময় মূল্য পরিশোধ করতে না পারে অথবা বাকি করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে উক্ত পদ্ধতি বৈধ হওয়ার উপায় হলো, বিক্রেতার নিকট থেকে ওই পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য কর্জ নেওয়া এবং তা দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা। কর্জ পরবর্তীতে আদায় করা।

স্বর্ণকারদের ছাই, মাটির ক্রয়-বিক্রয় :

স্বর্ণকারদের ভস্ম, মাটি যাতে স্বর্ণ রৌপ্যের টুকরা বিন্দুর উপস্থিতি থাকে। অনেকে তা ক্রয় করে তা থেকে স্বর্ণ রৌপ্য পৃথক করে নেয়। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা :

১। টাকার বিনিময়ে ওইগুলোর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

২। ভিন্ন জাতীয় বস্তু পণ্যের বিনিময়েও এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। উদাহরণস্বরূপ স্বর্ণের মাটি, ভস্ম রৌপ্যের বিনিময়ে এবং রৌপ্যের মাটি, ছাই স্বর্ণের বিনিময়ে যদি বিনিময়দ্বয়ের ওজনে ব্যবধানও হয় তখনও বৈধ। তবে হাতে হাতে লেনদেন হতে হবে।

৩। স্বর্ণের মাটি স্বর্ণের বিনিময়ে এবং রৌপ্যের মাটি রৌপ্যের বিনিময়ে কেবল ওই অবস্থায় বৈধ, যদি উভয় দিকে স্বর্ণের এবং রৌপ্যের পরিমাণ সমান হয় এবং লেনদেনও হাতে হাতে হয়। যদি কোনো একদিকে স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে উক্ত লেনদেন অবৈধ। খাঁটি স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পরিমাণ ও মাটির সাথে মিশ্রিত স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিমাণ থেকে বেশি না হওয়া চাই। কেননা উক্ত মাটির কোনো মূল্য নেই বিধায় স্বর্ণ বা রৌপ্যের কোনো অংশকে ওই মাটির মূল্য হিসেবে গণ্য করার অবকাশ নেই।

পুরাতন অলংকার দ্বারা নতুন অলংকার বিনিময় :

১। ক্রেতা পুরাতন মাল নিয়ে আসে এবং এর পৃথক মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং নতুন মালের আলাদা মূল্য নির্ধারিত থাকে। উভয়টার মধ্যে ব্যবধান যতটুকু হয় কেবল ওই টুকুরই লেনদেন করা হয়ে থাকে।

অনেকাংশে উক্ত লেনদেন এভাবেও হয়ে থাকে যে উদাহরণস্বরূপ ক্রেতার আনীত পুরাতন মালের সর্বমোট ওজন ছয় আনা, যার মূল্য ১৫০০০ টাকা এবং নতুন মালের সর্বমোট ওজন ৪ আনা, যার মূল্যও ১৫০০০ টাকা নির্ধারিত করা হয়। ওই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরাতন মাল দিয়ে নতুন মালে হাত বদল হয়। নগদ টাকার কারবার মোটেও থাকে না। উক্ত পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তে অবৈধ।

২। প্রশ্ন হলো, উক্ত পদ্ধতি যেহেতু অবৈধ। তাই পুরাতন অলংকার দিয়ে নতুন অলংকার গ্রহণের বৈধ উপায় কী?

উত্তর : দোকানদার প্রথমে ক্রেতার নিকট থেকে পুরাতন অলংকারগুলো টাকার বিনিময়ে ক্রয় করে নেবে এবং তাকে মূল্য পরিশোধ করে দেবে। পরে গ্রাহক নতুন অলংকার যা ক্রয় করবে। তার মূল্য গ্রাহকের নিকট থেকে উসুল করবে। উক্ত পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য শুধু দোকানদারের নিকট কিছু ক্যাশ টাকা রাখতে হবে। আর এটা কোনো কষ্টের বা অসম্ভব কিছু নয়। তবে যদি অলংকারকে অলংকার দ্বারা বদলি করতে চায় তাহলে নিম্নোক্ত বিষয় অনুসরণ করতে হবে।

১। উভয় দিকে যদি সাদাসিদে অলংকার হয় এবং দোকানদারের অলংকারের ওজন গ্রাহকের অলংকারের ওজনের সমান হয়। অথবা এর থেকে কিছু কম হয় এবং দোকানদার গ্রাহকের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু আদায় করতে চায়। তাহলে নিজের অলংকারের সাথে নকল অলংকারের কিছু জুড়ে দেবে।

হ্যাঁ, দোকানদারের অলংকারের ওজন যদি গ্রাহকের অলংকারের ওজন থেকে বেশি হয় তাহলে দোকানদার গ্রাহকের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিতে পারে।

২। যদি অলংকার পাথর জড়ানো হয় তাহলে সর্বপ্রকারের অলংকার অলংকারের বিনিময়ে পরিবর্তন হতে পারে। তখন এক পক্ষের অতিরিক্ত স্বর্ণ টাকাসহ যদি হয় তা অপর পক্ষের পাথরের মূল্য হয়ে যাবে।

৩। যদি এক পক্ষে সাদাসিদে অলংকার হয় অপর পক্ষে পাথর জড়িত। এমতাবস্থায় দোকানদার গ্রাহক থেকে অতিরিক্ত টাকা নিতে চাইলে। তাহলে-

ক. পাথর জাড়িত অলংকার যদি দোকানদারের হয় এবং সাদাসিদে অলংকার গ্রাহকের হয় তাহলে গ্রাহকের অলংকারের স্বর্ণ দোকানদারের অলংকারে অবস্থিত স্বর্ণের পরিমাণ থেকে বেশি হোক বা কম, অথবা সমান সর্বঅবস্থায় অতিরিক্ত টাকা নেওয়া বৈধ।

খ. যদি সাদাসিদে অলংকার দোকানদারের হয় এবং পাথর জড়ানো অলংকার গ্রাহকের হয় এমতাবস্থায় গ্রাহকের অলংকার স্বর্ণের পরিমাণ যদি দোকানদারের স্বর্ণের পরিমাণ থেকে কম হয় তাহলে দোকানদার গ্রাহক থেকে টাকা নিতে পারবে। আর যদি সমান সমান হয় অথবা বেশি হয়। তাহলে দোকানদার গ্রাহক থেকে অতিরিক্ত টাকা নিতে পারবে না।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

শাহাদাতে হুসাইন (রা.) ও শিয়া সম্প্রদায়

মুফতী জিয়াউর রহমান

রাসূলে আকরাম (সা.)-এর জীবদ্দশায় সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামের শাসনাধীন চলে আসে। উক্ত এলাকায় ইসলাম ও মুসলমানদের এমন কোনো শত্রু অবশিষ্ট ছিল না, যারা ইসলামের প্রচারাভিযান রুদ্ধ করতে পারে। হযরত আবুবকর (রা.)-এর সময় ইসলাম আরব উপদ্বীপের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর আমলে আজমের বহু এলাকা ইসলামের ছায়াতলে আসে। তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোম এবং পারস্যের অধিক অঞ্চলে ইসলামের পাতাক উড়তে থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত উসমান (রা.)-এর জামানায়ও বিজয়ের এই অপ্রতিরুদ্ধ ধারা অব্যাহত থাকে। ইসলামের বিজয় ধ্বনিতে দিগদিগন্ত উত্তাল থাকায় ইসলামের বিরোধিতা করার সাহস কারো ছিল না। এই বিশালায়তন ইসলামী শাসনে সকলে মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেও কিছুসংখ্যক মুনাফেক মুসলমানদের মাঝে প্রবেশ করে। এরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইহুদী। যেহেতু প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতায় মাঠে নামতে তারা সাহস পাচ্ছিল না তাই নিজেদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মানসেই ইসলামের খোলস পরেছিল তারা। এদের অন্যতম ছিল ইহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। তার লক্ষ্য ছিল, মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়ে বিশেষ কলাকৌশলের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করে আড়ালে-আবডালে ইসলামের নানাভাবে বিকৃতি সাধন, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও গোলযোগ সৃষ্টি করে ইসলামকে ধ্বংস করা।

প্রথমে সে কিছুকাল মদীনায় অবস্থান করে। সেখানে বসে অনেক কলাকৌশল আঁটতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে সে বুঝতে সক্ষম হয় যে, এখানকার মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা, মূল্যবোধ অতীব শক্তিশালী। সুতরাং এসব জানবাজ ইসলামী সৈনিকদের মাঝে ষড়যন্ত্র সফল হবে না। ফলে পর্যায়ক্রমে সে বসরা, সিরিয়া গমন করে। সেখানেও তার মিশন ব্যর্থ হয়। পরিশেষে সে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মিসর পাড়ি জমায়। সেখানে কয়েকজনকে তার সহযোগী হিসেবে পেয়ে যায়।

প্রথমে সে নবী (সা.)-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা প্রকাশ করে। মুসলমানদের মাঝে প্রচার করে, মুসলমানদের ব্যাপারে আমি আশ্চার্য হই যে, তারা পৃথিবীতে হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমণের বিশ্বাস রাখে কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসূল (সা.)-এর ব্যাপারে এই ধারণা রাখে না। তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে পুনরাগমণ করবেন। তার এই বক্তব্য প্রচারের পর মূর্খদের মাঝে কিছু সমর্থকও সে পেয়ে যায়। এরপর শুরু করল রাসূল (সা.)-এর সাথে হযরত আলী (রা.)-এর বিশেষ আত্মীয়তার কারণে তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নামে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা। একসময় প্রচার করতে থাকে, রাসূল (সা.)-এর পর খলীফা হওয়ার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন হযরত আলী (রা.)। প্রত্যেক নবীর একজন ভারপ্রাপ্ত থাকেন এবং ভারপ্রাপ্তই নবীর পর উম্মতের প্রধান হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। রাসূল (সা.)-এর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন হযরত আলী (রা.)। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর লোকেরা চক্রান্ত করে তাঁর অধিকারটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর পরিবর্তে আবুবকরকে খলিফা বানিয়েছে। অতঃপর উমরকে। উমরের পর হযরত আলীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছে। তাঁকে বাদ দিয়ে উসমানকে খলীফা বানানো হয়েছে। অথচ তিনি মোটেই যোগ্য ছিলেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর অভিযোগ করে বলে, উসমান ও তার গভর্নররা বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত কাজ করেছে। এসব বলে হযরত উসমান (রা.) ও তার খেলাফতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। বিভিন্ন স্থানে তার লোক পাঠিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্নরদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিষোদগার ও বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করে। একপর্যায়ে তারই ষড়যন্ত্রের কারণে বিভিন্ন স্থানে গভরর্নরদের বিরুদ্ধে অপবাদ ও সমালোচনার ধারা আরম্ভ হয়। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা বলে বেড়ায়, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং উম্মতের মাঝে সৃষ্ট ভ্রষ্টতা সংশোধনের চিন্তা ও চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তাই উসমান ও তার গভর্নরদের কারণে উম্মতের মাঝে যে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা দূর করার জন্য আমাদের তৎপর হতে হবে। এসব বলে হযরত উসমান (রা.)কে শহীদ করার জন্য বিভিন্ন আয়োজনে মেতে ওঠে।

তার চাতুর্যতা ও প্রতারণার শিকার হয়ে কিছু লোকের একটি দল হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সম্মত হয়। অতঃপর এই দলটি গোপনে সংঘবদ্ধভাবে মদীনায় পৌঁছে হযরত উসমান (রা.)কে মর্মান্তিকভাবে শহীদ

করে, যা ইসলামের এক হৃদয়বিদারক অধ্যায়।

হযরত উসমান (রা.) কে নির্মমভাবে শহীদ করার মাধ্যমে ইবনে সাবাগং নিযামে খেলাফত ধ্বংসে তাদের প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করে। মূলত হিজরী ২৫ সনে ইসলামী হুকুমত ধ্বংসে ইবনে সাবার যে ষড়যন্ত্রের গোড়াপত্তন করেছিল দীর্ঘ দশ বছর প্রয়াসের পর হিজরী ৩৫ সনে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার মধ্য দিয়ে তার প্রথম পর্ব শেষ হয়। তারপর আরম্ভ হয় ভেঙে পড়া খলাফতব্যবস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠিত ও পুনরায় সুসংহত হতে না পারার ভয়াবহ চক্রান্ত।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর রক্তে রঞ্জিত পরিবেশে সাবায়ী সম্প্রদায়ের চাপ ও তিন দিনের আল্টিমেটামের মুখে হযরত আলী (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.) নিঃসন্দেহে মানহাজে নবুওয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সঠিক খলীফা ছিলেন। উম্মতের মধ্যে তখন এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এই মহান পদের জন্য তাঁর চেয়ে বেশি উপযুক্ত বিবেচিত হবেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ফলে মুসলিম উম্মাহ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলিম ইতিহাসের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীন সংঘটিত হয়। এই ট্র্যাজেডি সৃষ্টির মূল হোতা যেমন ছিল সাবায়ী গোষ্ঠী, তেমনি তাদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের ফলে এই বিভক্তির ভয়াবহতা আরো কঠিন থেকে কঠিনতর হয়।

এসব যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার বিপুলসংখ্যক ভক্ত হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিল। হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীতে থাকায় ইবনে সাবা গোষ্ঠীর বিভ্রান্তি ছড়ানো আরো সহজ হয়ে পড়ে। এই সুবাদে তারা বিভিন্ন শিরকী ও কুফরী মতবাদ প্রচার করে মুসলমানদের মাঝে আরো বিভিন্ন প্রকার বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে। তারা প্রচার করে, হযরত আলী (রা.) পৃথিবীতে খোদার আকৃতি এবং তার দেহে খোদায়ী আত্মা প্রবিষ্ট রয়েছে। এমনকি সাবার গোষ্ঠী এও বলতে দ্বিধাবোধ করেনি যে, আল্লাহ তা'আলা রেসালাত ও নবুওয়াতের জন্য হযরত আলী (রা.) কেই মনোনীত করেন। কিন্তু ওহী বাহক হযরত জিব্রাঈল (আ.) ভুলবশত ওহী নিয়ে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর কাছে পৌঁছে যান। (নাউজু বিল্লাহ)

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, সাবায়ীদের এ ধরনের অপপ্রচারের কথা অবগত হয়ে হযরত আলী (রা.) তাদের হত্যা ও অগ্নিতে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)সহ কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে তা থেকে বিরত থাকেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে তারা বলতে লাগল যে, আগুনের শাস্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন। কাজেই আলী আল্লাহই বটে। হযরত আলী (রা.) কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষতক সাবায়ীরা মিসরে চলে যায় এবং খিলাফতে বনী ফাতেমী নামে পৃথক রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। ইতিহাসে এরাই শিয়া নামে পরিচিত। (রদ্দে শীইয়্যাত-মাওলানা জামাল উদ্দীন)

হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার নেপথ্যে কারা?

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে নিযামে খেলাফত ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হওয়ার পর জনগণের মধ্যে শাহাদাতে উসমানের প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। কারণ সাবায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা হযরত উসমান (রা.)-এর বিদ্বেষী হলেও তাঁর প্রতি সকল মুসলমানের পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন ছিল। শাহাদাতে উসমানের বিচার এবং দুষ্কৃতকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে হযরত মুআবিয়া (রা.) মাঠে নামেন এবং অভিযান চালিয়ে যান। এই তৎপরতা অনেক দীর্ঘ সময় চলে। এর মধ্যে সাবায়ী শিয়ারা চিন্তা করল যে, যদি ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি বড় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা না যায় তবে এই অপকর্ম ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হবে না এবং মুসলমানদের প্রতিশোধের তীর যেকোনো মুহূর্তে আমাদের বুকে এসে বিদ্ধ হতে পারে। উক্ত পরিকল্পনার বলি হিসেবেই নবীর দৌহিত্র হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস)

শাহাদাতে হোসাইন (রা.)-এর গোড়ার কথা :

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তিকালের আগ মুহূর্তে খলীফা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে তিনি ইয়াযীদকে খলীফা নিযুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করেন। তারা মত দেন এবং খেলাফতের বিভিন্ন এলাকায় লোকজন তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

এমতাবস্থায় বিষয়টি নিয়ে মক্কায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করা হলে, উক্ত পদ্ধতিতে ইয়াযীদকে খলীফা না বানানোর পরামর্শ দেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, সারা মুসলিম বিশ্ব ইয়াযীদের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছে। এখন আপনারা এই কয়জন এর বিরোধিতা করলে পুরো মুসলিম বিশ্বে বিরূপ প্রভাব পড়ার প্রবল আশংকা। তাই এ পরিস্থিতে এই বাই'আতের ওপর সকলের সম্মতি প্রয়োজন আছে।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তিকালের পর ৬০ হিজরী সনে ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহন করে। কিন্তু কুরাইশের খ্যতনামা লোকজন এবং হেজাজের নেতৃবৃন্দ তথা হযরত হোসাইন (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) বাইআত গ্রহণ করলেন না।

হযরত হুসাইন (রা.)-এর মক্কায় গমন :

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৃত্যুর পর ইয়াযীদ তখনকার মদীনার শাসক ওলীদ ইবনে উতবা ইবনে আবু সুফিয়ানের নিকট মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছায় এবং তার মাধ্যমে হুসাইন (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) কে ইয়াযীদের হাতে বাইআত হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ইয়াযীদের হাতে বাইআত হতে তাঁরা অস্বীকৃতি জানান। ফলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ওলীদের কাছে এক দিনের সময় চেয়ে রাতেই মদীনা ত্যাগ করে মক্কার পথে পাড়ি জমালেন। ওলীদ সংবাদ পেয়ে নিজের লোকদের দিয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করলেন। তিনি অপরিচিত রাস্তা বেছে নেওয়ায় তারা তাঁকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলো। আর দ্বিতীয় রাতে হযরত হুসাইন (রা.) স্বীয় ভগ্নি উম্মে কুলসুম আর জয়নব এবং ভাতিজা ও ভাগ্নে যথাক্রমে আবু বকর, জাফর, আব্বাস এবং আহলে বাইতের অন্য সদস্যদের সাথে নিয়ে মক্কার পথে রওনা হন। তাঁর ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া মদীনা ত্যাগ করা পছন্দ করলেন না। হযরত হুসাইন (রা.) মক্কায় রওনার প্রাক্কালে তার ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া তাকে অনেক নসিহত করেন। তার মধ্যে একটি এও ছিল, লোকজন আপনার হাতে বাইআত হলে আলহামদু লিল্লাহ। অন্যথায় আপনি এমন কোনো শহরে যাবেন না, যেখানকার মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল আপনার পক্ষে অপর দল আপনার বিপক্ষে...। ইমাম হুসাইন (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে ভাই আমি কোথায় যাব? মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বললেন, আপনি মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন।

এ কারণে হযরত হুসাইন (রা.) মক্কায় পৌঁছে আবু তালেবের ঘাঁটিতে অবস্থান নিলেন এবং সেখানকার লোকেরা জড়ো হয়ে তার নিরাপত্তায় আত্মনিয়োগ করেন। হযরত হুসাইন (রা.) কে পেয়ে তাঁরা খুবই আনন্দিত হলেন। এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) খানায়ে কা'বার এক প্রান্তে অবস্থান করছিলেন। তিনি সারাটি দিন নামায আর তাওয়াফের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। কখনও কখনও হযরত হুসাইন (রা.)-এর নিকট এসে পরামর্শে শরীক হতেন।

কূফার পথে হযরত হুসাইন (রা.)

হযরত হুসাইন (রা.) মক্কায় আসার পর কূফার নেতৃস্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে প্রায় দেড় শত চিঠি হযরত হুসাইনের নামে প্রেরণ করা হয়। সেসব চিঠির সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ। আল্লাহ পাকের শোকর যে, আপনার প্রতিপক্ষ মৃত্যু নিদ্রায় শায়িত। এখন আমরা ইমামবিহীন অবস্থায় আছি। আপনি দ্রুত তাশরীফ নিয়ে আসুন। যাতে আপনার সাহায্যে আমরা সত্যের ওপর একত্রিত হতে পারি। নূমান ইবনে বশির (কুফার গভর্নর)-এর পেছনে আমরা জুমুআর নামায পড়ি না। ঈদের নামাযও পড়ি না। আমরা যদি অবগত হই যে, আপনি তাশরীফ নিয়ে আসছেন তাহলে আমরা তাকে সিরিয়ার সীমান্তে পাঠিয়ে দেব।

এসব চিঠিপত্র ছাড়াও কূফার বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হযরত হুসাইনের (রা.) খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কূফায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। ব্যাপকহারে অনুরোধ ও আবেদন করতে থাকলে হযরত হুসাইন (রা.) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে আকীলকে কূফায় প্রেরণ করেন। সংক্ষেপে বলা হয় যে, মুসলিম ইবনে আকীল কূফাবাসীর গাদ্দারীর ফলে তার হাতে বাইআত হওয়া ১৮ হাজার লোকের ৩০ জন ব্যতীত সবাই তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় নিঃসঙ্গ হয়ে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (আল কামেল ৩/৭৯, ৩৮৭-৩৮৯, ৯৮, তারিখে ত্বাবারী ৩/২৭১, আল বিদায়া ৭/১৫৫)

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সাবায়ী সম্প্রদায়ের অনুসারী কূফার লোকেরা হযরত হুসাইন (রা.)-এর দূত মুসলিম ইবনে আকীলকে নিঃসঙ্গ করে পালিয়ে যাওয়াটা ছিল তাদের প্রথম গাদ্দারী। এদিকে মুসলিম ইবনে আকীলের শাহাদাতের পূর্বেই হযরত হুসাইন (রা.) কে কূফার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা হয় এবং তাকে কূফা গমনের জন্য বলা হয়। সেই হিসেবে হযরত হুসাইন (রা.) কূফায় আসার সংকল্প করেন। তাঁর সহমর্মীগণ তাঁকে না আসার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.) জবাব দেন আমি স্বীয় পিতার নিকট শুনেছি যে, হারাম শরীফের একটি মেষ হারাম শরীফের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত করার কারণ হবে। আমি সেই মেষ বনতে চাই না।

পরিশেষে ৬০ হিজরীর ৮ই যিলহজ তিনি পরিবার-পরিজন, ভক্ত-অনুরক্ত ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মক্কা থেকে কূফার পথে রওনা হন। সাফফা নামক স্থানে পৌঁছে তার সাক্ষাৎ হয় এক বিখ্যাত ইসলামী কবির ফারাযদাকের সাথে। যিনি ইরাক থেকে এসেছিলেন। হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর নিকট ইরাকের অবস্থা জানতে চাইলেন। ফারাযদাক বললেন, ইরাকবাসীর অন্তর আপনার সাথে, কিন্তু তাদের তরবারি বনুউমাইয়ার সাথে আর ফায়সালা তো আল্লাহর হাতে।

হযরত হুসাইন (রা.) যাওয়ার পথে অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সকলে তাকে মক্কার দিকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এমনকি সালাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি মুসলিম ইবনে আকীলের শাহাদাতের সংবাদ পান। এরপর অনেকে তাঁকে অত্যন্ত জোরালোভাবে কূফায় গমণ না করার

পরামর্শ দেন। এও বলেন যে, কূফায় আপনার কোনো সমর্থক ও সহযোগী আছে বলে আমাদের মনে হয় না। যাবলা নামক স্থানে পৌঁছালে তিনি স্বীয় দুধ ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে বাকতারের শাহাদাতের সংবাদপ্রাপ্ত হন। এসব সংবাদের ভিত্তিতে তিনি কূফার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তিনি স্বীয় সাথীদের বললেন, কূফাবাসীরা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা নেই। সুতরাং আমার যেসব সাথীরা ফিরে যেতে ইচ্ছুক তারা খুশিমনে ফিরে যেতে পারো। আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ অনুমতি আছে। এই এলান শুনে অধিকাংশ সাথী ইমাম হুসাইন (রা.)কে ছেড়ে বাড়ির দিকে ফিরে গেল। শুধু তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ এবং খাস কয়েকজন প্রাণউৎসর্গকারী সহকর্মী সাথে থাকলেন। (আল কামেল ৩/৪৩৮)

কারবালার ময়দানে হযরত হুসাইন (রা.)

হযরত হুসাইন (রা.)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে ইবনে যিয়াদ ইয়াযীদের নির্দেশমতো মক্কা-মদীনা থেকে ইরাক অভিমুখী সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয় এবং হুর ইবনে ইয়াযীদ তামিমীকে এক হাজারের বাহিনী দিয়ে হযরত হুসাইনের সন্ধানে এবং তাকে ঘিরে ফেলার জন্য পাঠায়।

হুর বিভিন্ন বাহান ও ওয়াদা ভঙ্গ করে হযরত হুসাইন (রা.) কে কারবালার মাঠে অবরুদ্ধ করে। ইমাম হুসাইন (রা.) এবং সাথীগণ ৬১ হিজরী ২রা মুহাররম কারবালার ময়দানে অবতরণ করেন। কারবালার ময়দানে হুসাইন (রা.)-এর পানি সংগ্রহের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। হযরত হুসাইন (রা.) যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করলে ইবনে যিয়াদের বাড়াবাড়ির কারণে তা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে ৬১ হিজরীর ১০ মুহাররম কারবালার যুদ্ধে শত শত শত্রুবাহিনী নিহত হয় এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর সকল সাথী বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। কী মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক পরিবেশ। এখন শুধুমাত্র হযরত হুসাইন (রা.) জীবিত আছেন। তলোয়ার হাতে শত্রুদের সাথে লড়তে লাগলেন। তাঁর তলোয়ারের আঘাতে শত্রুবাহিনীর লাশ পড়ছে। তিনিও আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছেন। নবী দৌহিত্রের পবিত্র জিসিম মোবারক থেকে তাজা খুন ঝরছে। কিন্তু কোথায় সে গাদ্দার সাবায়ী গোষ্ঠী শিয়ারা। হাজার হাজার পত্র প্রেরণ করে রাসূল (সা.)-এর কলিজার টুকরাকে ডেকে এনেছে। এহেন বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে সে গাদ্দারদের হুসাইনী মুহাব্বত, প্রেম ভালোবাসা কোথায় গেল?

রাসূল (সা.)-এর নয়নমণি, কলিজার টুকরা কারবালা প্রান্তরে একাই লড়ে যাচ্ছেন, আঘাতের ওপর আঘাত তাঁর পবিত্র শরীরের ওপর। শিমারের নির্দেশে হুসাইন ইবনে তামীমের তীরের আঘাতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। অরআ বিন শুরাইক তামীমী তার ওপর তরবারির আঘাত করে। সিনান ইবনে আনাসের বর্শার আঘাতে তিনি জমিনে লুটে পড়েন। এমতাবস্থায় তারবারি দিয়ে তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে তাঁর শরীরে বর্শার ৩৩টি আঘাত এবং তরবারির ৩৩টি আঘাত ছিল। তীরের আঘাত ছিল অগণিত। (শহীদে কারবালা ৯৭, আল কামেল লি ইবনে আছীর ৩য় খণ্ড)

একটি সুদীর্ঘ ইতিহাসকে এখানে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের এই ইতিহাসটি এতই গুরুত্বপূর্ণ, যার সঠিক বিবরণ জানা ছাড়া ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের একটি বিশাল অধ্যায় সম্পর্কে অজ্ঞই থাকতে হয়। সাবায়ীদের এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত না হলে বর্তমানেও ইসলামের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের এ অধ্যায়টুকু গ্রহণ করতে গেলে বেশির ভাগ লোকই বিভ্রাটে পতিত হতে বাধ্য। কারণ মুসলমানদের এহেন দুর্দিনে সাবায়ীদের কালো হাত ইসলামের বিভিন্ন অধ্যায়ে যেমন সম্প্রসারিত ছিল, তেমনি ইসলামের শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ করে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। যার কারণে শুধু ইতিহাস গ্রন্থ থেকে এসব বিষয়ে সঠিক তত্ত্ব আহরণ করতে গেলে যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হোক বিপদগামী হতে হয়। তাই সলফদের নীতি হলো ইতিহাস থেকে ওই সব বিষয় গ্রহণ করা যাবে, যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কিছু লিখতে গেলে বা বক্তব্য দিতে গেলে ওই নীতি গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, যে ষড়যন্ত্রের কারণে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটে, জঙ্গে সিফফীন ও জঙ্গে জামালের ঘটনার ভয়াবহ দিকগুলোও ওই ষড়যন্ত্রের অংশ। অনুরূপ হযরত হুসাইন (রা.)-এর মর্মবিদারী ভয়াবহ শাহাদাতের ঘটনাতেও ওই ষড়যন্ত্রের কালো হাত পুরোপুরিভাবে প্রসারিত। উক্ত ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা এখনও শেষ হয়নি। তৎপরবর্তী প্রত্যেক যুগেই এই ধারাবাহিকতা চলে এসেছে। বর্তমানেও ইসলামের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হয়ে থাকে তার মাঝে সাবায়ী শিয়াদের কোনো কোনো যোগসাযশ বিদ্যমান নেই এমনটা বলা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে যাবতীয় ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

আশুরার তাৎপর্য ও করণীয়

মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

ইসলামী বছরের প্রথম মাস মুহাররামুল হারাম। এই মাস অগণিত ফজীলত ও বরকতের মাস। ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগেও এই মাসকে সম্মানিত মনে করা হতো। এই মাসের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে আরবগণও যুদ্ধবিগ্রহ মওকুফ রাখত। তাতে বোঝা যায়, এই মাস শুধু ইসলামেই মর্যাদাপূর্ণ তা নয় বরং এর ইজ্জত-ইহতিরাম, সম্মান ও মর্যাদা বহু আগে থেকেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ (التوبة).

নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজেদের ওপর কোনো জুলুম করো না।{সূরা তাওবা : ৩৬}

হাদীস শরীফে এসেছে–

السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادى وَشَعْبَانَ (رواه البخارى)

বছর হলো বারো মাসের সমষ্টি, তার মধ্যে চারটি অতি সম্মানিত। তিনটি পর পর লাগোয়া জিলকদ, জিলহজ ও মুহাররম আর (চতুর্থটি হলো) জুমাদাস সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব।

(বোখারী : ২৯৫৮)

ইসলামে এই মাসের মর্যাদা ও সম্মান পূর্ববর্তীদের মতো ধরে রাখা হয়েছে। এই মাসকে شهر الحرام (সম্মানের মাস) এবং شهر الله (আল্লাহর মাস) আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে এসেছে–

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّم

অর্থাৎ, রমাজানের পর সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহররম (মাসের) রোজা। (সহিহ মুসলিম, ১৯৮২)

এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহ.) লেখেন, এই মাসের সম্মান ও মর্যাদার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, এটিকে 'আল্লাহর মাস' বলা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজ খাস মাখলূককেই তার প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে থাকেন। (শরহে নববী ৮/৫৫)

হিজরী সনের গোড়াপত্তন

ইসলামী সাল গণনায় নতুন বর্ষ আরম্ভ হয় মুহাররম মাস থেকে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত উমর (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে ইসলামী সাল গণনার এই রীতি আরম্ভ করেন। ইবনুল আসীর (রহ.) বলেন, হিজরী সন নিয়ে সাল গণনার গোড়াপত্তন হয় হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে। তার প্রেক্ষাপট ছিল এই, একদা হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.) প্রতি প্রেরিত পত্রে লেখেন যে, আমাদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি চিঠিপত্র প্রেরণ করা হয়; কিন্তু তাতে কোনো তারিখ থাকে না। (অর্থাৎ পত্রটি কখন লেখা হয়েছে তার হদিস থাকে না) বিষয়টি নিয়ে হযরত উমর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। কোনো কোনো সাহাবী (রা.) পরামর্শ দিলেন, নবুওয়াতের বর্ষ থেকে সাল গণনা আরম্ভ করা হোক। কেউ কেউ হিজরতের বছর থেকে আর কেউ কেউ রাসূল (সা.)-এর ওফাতের বর্ষ থেকে সাল গণনা আরম্ভ করা হোক বলে মন্তব্য ব্যক্ত করেন। তবে বেশির ভাগ সাহাবায়ে কেরামের রায় ছিল হিজরতের বর্ষ থেকে ইসলামী সাল গণনা আরম্ভ করা হোক। হযরত উমর (রা.) এ মতের ওপরই সিদ্ধান্ত দিলেন। (আল কামেল ফিততারীখ ১/১০) কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, তারপর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরামর্শ হলো কোন মাস থেকে সাল গণনা আরম্ভ করা হবে। কেউ কেউ রমাজান এবং কেউ কেউ মুহাররম মাসের পরামর্শ দেন। কারণ মুহাররম মাসে মানুষ হজ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। তা ছাড়া এই মাসের সম্মান ও মর্যাদা অপরিসীম। (আলকামেল ফিততারীখ ১/১০) এর আরেকটি কারণ হলো রাসূল (সা.) হিজরতের ইচ্ছা করেছিলেন মুহাররম মাসে। তবে হিজরত আরম্ভ করেছিলেন রবীউল আওয়াল মাসে। (ফতহুল বারী ৭/২৬৭)

মুহাররম মাসে রোযা

মুহাররম মাস যেমন বড়ই ফজীলতপূর্ণ মাস, এ মাসের রোযাও অতীব ফজীলতপূর্ণ। রাসূল (সা.) অন্যান্য রোযার প্রতি যেমন মুসলমানদের উৎসাহিত করেছেন, তেমনি মুহাররম মাসের রোযার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছেন।

হযরত নূমান ইবনে সা'আদ হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, কোনো ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, রমাজান মাসের রোযা ব্যতীত রাসূল (সা.) আর কোন মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি এ বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তিকেই জিজ্ঞেস করতে দেখেছি। সে সময় আমিও উপস্থি ছিলাম। সে বলল, হে

আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে রমাজান ব্যতীত আর কোন মাসের রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, রমাজানের পর যদি তোমরা রোযা রাখতে চাও তবে মুহাররম মাসে রোযা রাখো। কারণ এটি আল্লাহর মাস। এই মাসে এমন একটি দিন আছে, যে দিন আল্লাহ তা'আলা একটি সম্প্রদায়ের তাওবা কবুল করেছেন। সেদিন অন্যান্য সম্প্রদায়ের তাওবাও কবুল করবেন। (তিরমিযী, হা. ৭৪১) এই হাদীস থেকে মুহাররম মাসের বেশি বেশি রোযা রাখার গুরুত্ব বোঝা যায়।

আশুরার দিনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মুহাররম মাসের দশম তারিখকে আশুরা বলা হয়। عاشوراء শব্দটি عشر থেকে উৎকলিত। তা থেকে উদ্দেশ্য মুহাররম মাসের দশ তারিখ। فاعولاء এর ওজনে মোবালাগা হিসেবে عاشوراء বলা হয়ে থাকে। আশুরার সাথে নবী-রাসূলগণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঘটনা এই দিনে সংঘটিত হওয়া আশুরার মর্যাদা ও সম্মানের স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ উমদাতুল কারীতে আশুরার দিনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, আশুরার দিন হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়, ওই দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এই দিনেই তাঁর তাওবা কবুল হয়। আশুরার দিন হযরত নূহ (আ.)-এর কিশতী জুদি পাহাড়ে এসে স্থিত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে নমরূদের প্রজ্জলিত আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এই দিনে। হযরত মুসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল এই দিনই ফেরাউনের অকথ্য নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে নাজাতপ্রাপ্ত হন এবং ফেরাউন তার বিশাল বাহিনীসহ এই দিনই নীল নদে ডুবে ধ্বংস হয়। হযরত আইউব (আ.) রোগ থেকে শেফা পান এই দিনে। হযরত ইদ্রিস (আ.) কে এই দিনই আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। হযরত সুলায়মান (আ.) এই দিন বিশাল আয়তনের বাদশাহী প্রাপ্ত হন। এদিন হযরত ইয়াকুব (আ.) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান, হযরত ইউসুফ (আ.) কে কূপ থেকে বের করা হয়, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে বের হওয়া, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম এবং আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ইত্যাদি সব এই আশুরার দিন সংঘটিত হয়। (উমদাতুল কারী শরহে বোখারী, বাবু সিয়ামি ইয়াওমি আশুরা: ১১/১১৬-১১৮)

হাদীস শরীফে আশুরার ইতিহাস সম্পর্কে এসেছে–

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قال :قدم النبى -صلى الله عليه وسلم - المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال :(مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِى إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قال :فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ) (رواه البخارى) .

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনায় আগমন করে দেখতে পেলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই দিন রোযা রাখো কেন? তারা বলল, এটি একটি ভালো দিন। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইলকে তাদের দুশমনের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন। তাই মুসা (আ.) রোযা পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মুসাকে অনুসরণের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। অতঃপর তিনি রোযা রেখেছেন এবং রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (বোখারী : ৪/২৪৪ হা. ২০০৪, মুসলিম ১১৩০, আবু দাউদ ২/৪২৬ হা. ২৪৪৪ ইত্যাদি)

মুসনাদে আহমদে এক রেওয়ায়াতে আছে–

عن أبى هريرة وزاد" :وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودى.

এটি সেই দিন, যাতে নূহ (আ.)-এর কিশতি জুদি পর্বতে স্থির হয়েছিল, তাই নূহ (আ.) আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ার্থে সেদিন রোজা রেখেছিলেন। (মুসনাদে আহমদ ২/৩৫৯)

হযরত আদম (আ.) থেকে ইয়াওমে আশুরার সাথে নবীগণের যে সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত তা উক্ত হাদীসদ্বয়ের দুটি ঘটনার মাধ্যমে আরো স্পষ্ট হয়। সুতরাং এসব ঘটনার কোনো ভিত্তি নেই বলে সব কিছু এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

আশুরার দিনের রোযা

উপরে উল্লেখিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে ইয়াওমে আশুরার রোযাও পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতের মধ্যে প্রচলিত ছিল। হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর উম্মত ফেরাউনের নিপীড়নের কবলমুক্ত হওয়ার খুশি ও আল্লাহর শোকর আদায়ে এই রোযা রাখতেন। নবী করীমও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে এই রোযা রাখার প্রতি গুরুত্ব সহকারে উৎসাহ প্রদান করেন। তা ছাড়াও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশুরার দিন রোযা রাখার অগণিত ফজীলত বর্ণনা করেছেন। রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামও এই রোযা রাখতেন এবং উম্মত এই রোযা কিভাবে রাখবে তারও দিকনির্দেশনা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদান করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে–

عن أبى قتادة رضى اللّٰه عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " :صيام يوم عاشوراء ، أحتسب على اللّٰه أن يكفر

খায়নি, সে যেন রোযা পালন করে। কেননা আজকের দিন 'আশুরার দিন'। (বোখারী ৪/২৪৫ হা. ২০০৭, মুসলিম ১১৩৫, নাসাঈ ৪/১৯২, দারামী ২/২২ ইত্যাদি)

وعن أبى موسى الأشعرى رضى اللّٰه عنه قال" :كان يوم عاشوراء يوماً تعظّمه اليهود، وتتخذه عيداً، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم : "صوموه أنتم . "

وفى رواية لمسلم " :كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ، يتخذونه عيداً، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم : فصوموه أنتم ."

আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আশুরার দিনকে ইহুদীগণ ঈদ মনে করত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরাও এ দিনে রোযা রাখো।' (বোখারী ৪/২৪৪ হা. ২০০৫, মুসলিম ১১৩১)

عن عائشة رضى اللّٰه عنها قالت ": كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان كان من شاء صام، ومن شاء أفطر ."

وفى رواية " :كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية، وكان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يصومه فى الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء ، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه . "

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমে 'আশুরার দিনে রোযা পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে যখন রমাজানের রোযা ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা আশুরার রোযা রাখত, আর যার ইচ্ছা রাখত না। আরেক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে কুরাইশগণ

اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم أعطيناها إياه، حتى يكون الإفطار . "

وفى رواية " :فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم، حتى يتموا صومهم ."

হযরত রুবায়্যি বিনতে মুয়াওয়্যায ইবনে আফরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশুরার দিন ভোরে এক ব্যক্তিকে মদিনার পার্শ্ববর্তী আনসারী সাহাবীদের জনপদে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, সে যেন এ ঘোষণা করে দেয়, রোযা রাখা অবস্থায় যার ভোর হয়েছে, সে যেন তার দিনকে পূর্ণ করে। আর যার ইফতার অবস্থায় ভোর হয়েছে, সে যেন তার দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত অবস্থায় পূর্ণ করে। এরপর আমরা এদিন রোযা পালন করতাম এবং আমাদের ছোট ছোট সন্তনদেরকেও আল্লাহ চাহে তো রোযা পালনে অভ্যস্ত করে তুলতাম। আমরা তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম এবং তাদের জন্য পশমের খেলনা বানিয়ে দিতাম। যখন তারা খাওয়ার জন্য কাঁদত, তখন আমরা তাদেরকে সে খেলনা প্রদান করতাম। এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। (বোখারী ৪/২০০ হা. ১৯৬০, মুসলিম ২৫৪০, মুসনাদে আহমদ ৬/৩৫৯ ইত্যাদি)

وعن سلمة بن الأكوع رضى اللّٰه عنه ، أن رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً من أسلم" :أن أذّن فى الناس :من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء . "

সালামা ইবনু আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে লোকজনের মধ্যে এ মর্মে ঘোষণা দিতে আদেশ করলেন যে, যে ব্যক্তি খেয়েছে, সে যেন দিনের বাকি অংশে রোযা পালন করে, আর যে

السنة التى قبله . "

হযরত আবু কাতাদা সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আশুরার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন। (মুসলিম : ১১৬২, আবু দাউদ ২/৩২১, হা. ২৪২৫, তিরমিযী ২/১১৫, হা. ৭৪৯, ইবনে মাজা ১/৫৫৩ হা. ১৭৩৮, মুসনাদে আহমদ ৫/৩০৮, বায়হাকী ৪/২৮৬)

আরেক হাদীসে এসেছে–

عن عبد اللّٰه بن أبى يزيد أنه سمع ابن عباس رضى اللّٰه عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء ؟ فقال " :ما علمت أن رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهراً إلا هذا الشهر -يعنى رمضان . "-وفى لفظ " :ما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم :يوم عاشوراء .

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রোযা রাখার জন্য এত অধিক আগ্রহী হতে দেখিনি, যত দেখেছি এই আশুরার দিন এবং এই মাস অর্থাৎ রমাজান মাসের রোযার প্রতি। (বোখারী : ৪/২৪৫ হা. ২০০৬, মুসলিম হা. ১১৩২, নাসায়ী ৪/২০৪ হা. ২৩৭০, মুসনাদে আহমদ ১/৩৬৭, ইবনে খুযায়মা ২০৮৬, বায়হাকী শুআবুল ঈমান ৩৭৭৯, সুনানে কুবরা ৪/২৮৬, তাবারানী ১২৫৪)

وعن الرُّبيع بنت معوّذ رضى اللّٰه عنها قالت" :أرسل رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التى حول المدينة :من كان أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كان مفطراً فليتم بقية يومه، فكنّا بعد ذلك نصومه، ونصوّمه صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم

'আশুরার রোযা পালন করত এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও এ রোযা রাখতেন। যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন তখনও এ রোযা রাখতেন এবং তা রাখার নির্দেশ দেন। যখন রমাজানের রোযা ফরয করা হলো তখন আশুরার রোযা ছেড়ে দেয়া হলো, যার ইচ্ছা সে পালন করবে, আর যার ইচ্ছা পালন করবে না।' (বোখারী ৪/২৪৪ হা. ২০০১, মুসলিম ১১২৫, আবু দাউদ ২/৩২৬ হা. ২৪৪২, তিরমিযী ২/১১৮, মুআত্তা মালেক ১/২৯৯, মুসনাদে আহমদ ৬/২৯, ৫০, ১৫২ ইত্যাদি)

عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال " :كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال :من شاء صامه، ومن شاء لم يصمه . "

وفى رواية :وكان عبد اللَّه لا يصومه إلا أن يوافق صومه .

وفى رواية لمسلم " :إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء ، وأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صامه، والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما افترض، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " :إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه . "

وفى رواية له أيضاً " :فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه. "

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরার দিন আইয়ামে জাহেলিয়্যাতে রোযা রাখা হতো, যখন রমাজানের রোযার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন আশুরার রোযাকে মুসলমানদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, যার ইচ্ছা রাখবে, যার ইচ্ছা রাখবে না। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, জাহেলী যুগে আশুরার রোযা রাখা হতো। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুসলমানগণ রমাজানের রোযা ফরজ হওয়ার আগ পর্যন্ত আশুরার রোযা রাখতেন। রমাজানের রোযা ফরজ হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আশুরা আল্লাহর দিনসমূহের একটি দিন। সুতরাং যে চাও রোযা রাখো, যে চাও ছেড়ে দাও। (বোখারী ৪/১০২, ২৪৪ হা. ১৮৯২, ২০০০, মুসলিম ১১২৬, আবু দাউদ ২/৩২৬ হা. ২৪৪৩, ইবনে মাজাহ ১/৫৫৩ ইত্যাদি)

عن حميد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوية رضى اللَّه عنه يقول :سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : "هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب اللَّه عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر . "

যে বছর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হজ করেন সে বছর আশুরার দিনে (মসজিদে নববীর) মিম্বরে তিনি (রাবী) তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের 'আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) কে বলতে শুনেছি যে, আজকে আশুরার দিন, আল্লাহ তা'আলা এর রোযা তোমাদের ওপর ফরয করেননি বটে, তবে আমি (আজ) রোযা রেখেছি। যার ইচ্ছা সে রোযা রাখুক, যার ইচ্ছা না রাখুক।' (বোখারী ৪/২৪৪ হা. ২০০৩, মুসলিম ১১২৯, নাসায়ী ৪/২০৪, মুআত্তা মালেক ১/২৯৯ ইত্যাদি)

আশুরার রোযা কয়টি?

আশুরার রোযা দুটি। ৯ ও ১০ তারিখ। তা নাহলে ১০ ও ১১ তারিখ। হাদীস শরীফে এসেছে–

عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع . "

وفى رواية قال " :حين صام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه، قالوا :يا رسول اللَّه إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :فإذا كان العام القابل -إن شاء اللَّه -صمنا اليوم التاسع، قال :فلم يأت العام المقبل، حتى توفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . "

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আশুরার দিন রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদী এবং নাসারারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী বছর আগমনের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। (মুসলিম ২৫৩৭, আবু দাউদ ২/৩২৭ হা. ২৪৪৫, মুসনাদে আহমদ ১/২৩৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩১৪ হা. ৯৩৮১, তাহাবী ২/৭৮, তাবারানী ১১/১৬, বায়হাকী ৪/২৮৭)

عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أيضاً ، قال :قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " :صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوماً، أو بعده يوماً . "

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আশুরার দিন রোযা রাখো এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ করো। আশুরার আগে এক দিন বা পরে এক দিন রোযা রাখো। (মুসনাদে আহমদ ১/২৪১, ইবনে খুযাইমা ২০৯৫, বায়হাকী ৪/২৮৭, অন্য রাবীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী ফিল কামেল ৩/৯৫৬, কাশফুল আস্তার ১০৫২, তাহাবী ২/৭৮, বায়হাকী ৪/২৮৭)

উল্লিখিত হাদীসসমূহ ও অন্যান্য

হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেন, রোযা দুই দিন রাখা মুস্তাহাব। ৯ ও ১০ তারিখ, তা না হলে ১০ ও ১১ তারিখ। কারণ এ ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত। তাই ফকীহগণ আশুরার সময় একটিমাত্র রোযা রাখাকে মাকরূহ বলেছেন।

ويستحب ان يصوم يوم عاشوراء يصوم يوم قبله او يوم بعده- ليكون مخالفا لاهل الكتاب

(قوله عاشوراء وحده) اى مفردا عن التاسع او عن الحادى عشر، لانه تشبه باليهود- (رد المحتار ٢/٣٧٥)

সন্দেহের নিরসন

অনেক লোক মনে করে থাকে, মুহাররম এবং আশুরার ফজীলত ও আমল কারবালায় সায়্যিদিনা হযরত হুসাইন (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি একটি চরম ভুল ধারণা। বরং একটি সম্প্রদায় হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনাকেই মুহাররম এবং আশুরার তাৎপর্যের মূল বিষয় বলে প্রচার করে মুসলিম সমাজে পূর্ব থেকে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রেখেছে। তারা আশুরাকে শুধু শোক প্রকাশের মাধ্যমেই পালন করে থাকে। যার সাথে ইসলামী শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ উল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মুহাররম এবং আশুরার গুরুত্ব ও মর্যাদা বহু আগে থেকেই বিধিত। হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে বহু নবী-রাসূলের সাথেই মুহাররমের মর্যাদার সম্পর্ক। পূর্ববর্তী নবীদের সুন্নাতকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর উম্মতের জন্য নিয়ামত হিসেবে আশুরার রোযা রাখার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তা থেকে বোঝা যায়, হযরত হুসাইন (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনার সাথে মুহাররম ও আশুরার তাৎপর্যের কোনো শরীয়ত বিধিত সম্পর্ক নেই। তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কলিজার টুকরা হযরত হুসাইন (রা.)-এর কারবালার ময়দানে শাহাদাত বরণ ইসলামের ইতিহাসে একটি হৃদয়বিদারক অধ্যায়। কিন্তু ইসলামে যেহেতু জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালনের কোনো বিধিত পন্থা নেই সুতরাং হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে আশুরার দিন বা তার আগে ও পরে বিভিন্ন বৈধ-অবৈধ কর্মকাণ্ড ঘটানোর কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। এসব কুপ্রথা, কুসংস্কার ও বিদ'আত মুসলমানদের ওপর জোর করে বা কৌশলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। এ সকল বিদ'আত এবং কুসংস্কার সম্পর্কে মুসলমানগণ আগেও সতর্ক ছিলেন এখনও সতর্ক থাকবেন। ইনশাআল্লাহ।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৭

এখন আমরা মূল আলোচনার দিকে যাচ্ছি। লা-মাযহাবী এবং আমাদের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ কিছু মাসআলার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করতে প্রয়াস পাব। ইনশাআল্লাহ।

নামাযে হাত কোথায় বাঁধবে?

লা-মাযহাবীরা নামাযে সীনার ওপর হাত বেঁধে থাকে। তারা ডাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে যে, এ পদ্ধতিতে হাত বাঁধাটাই সুন্নাত। অথচ আমরা ইতিহাসের আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পাই, প্রায় তিনশত হিজরী পর্যন্ত এভাবে হাত বাঁধার কোনো প্রচলন উম্মাহর মাঝে ছিল না। আমাদের দাবির স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ এটাই যে, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর কালজয়ী হাদীসগ্রন্থ "জামে তিরমিযী" শরীফে মাত্র দুটি মত উল্লেখ করেছেন। একটি নাভির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কীয়, অপরটি নাভির ওপর হাত বাঁধা সম্পর্কীয় হাদীস। সেখানে তিনি বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কীয় কোনো হাদীসই উল্লেখ করেননি। আজকালকার লা-মাযহাবীরা তো আরো একধাপ এগিয়ে। তারা বুকেও হাত বাঁধে না বরং তারা হাত বাঁধে গলদেশের নিচে এবং সীনার ওপর।

হাদীসে হাত বাঁধা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা বিবৃত হয়েছে। এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) এক হাত দিয়ে অন্য হাতকে শক্তভাবে ধরেছেন। অন্য হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) ডান হাতের তালু মুবারক বাম হাতের পৃষ্ঠের ওপর রেখেছেন। অন্য হাদীসে নাভির ওপরে অথবা নাভির নিচে হাত বাঁধার কথা বলা হয়েছে। তাই আমাদের ওলামায়ে কেরাম হাত বাঁধার সুন্নাত পদ্ধতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের গিরাকে শক্তভাবে ধরবে, এরপর ডান হাতের তালু এবং অবশিষ্ট তিন আঙুল বাম হাতের পিঠের ওপর রাখবে। এভাবে হাত বাঁধার মাধ্যমে ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর রাখা এবং এক হাত দিয়ে অন্য হাতকে শক্তভাবে ধরা, হাদীসদ্বয়ের ওপর পূর্ণভাবে আমল হয়ে গেল। এরপর নাভির নিচে অথবা নাভির ওপর হাত বাঁধার মাধ্যমে ঐ হাদীসের ওপরও আমল হয়ে যাবে, যে হাদীসে নাভির নিচে অথবা ওপরে হাত বাঁধার কথা বলা হয়েছে। এভাবে আমল করার মাধ্যমে হাত বাঁধা সম্পর্কীয় যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সব হাদীসের ওপর আমল হয়ে যাচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে ওলামায়ে কেরামের কাছে গ্রহণযোগ্য মাযহাব। তিনশত হিজরী পর্যন্ত এর বিপক্ষে কোনো মাযহাবের উল্লেখ পাওয়া যায় না। লা-মাযহাবীরা কত সূক্ষ্মভাবে তথ্য সন্ত্রাস করে দেখুন! তারা তাদের স্বপক্ষে সহীহ ইবনে খোযায়মা এবং মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলের হাদীস প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু ওই হাদীসে বুকে হাত বাঁধার কথা বলা হয়েছে। হাদীসের শব্দ হচ্ছে اعلى الصدر অথচ তারা হাত বাঁধে সীনার ওপর। অর্থাৎ- فوق الصدر হাদীসের ওপর আমল করার ছদ্মবেশে কত বড় জালিয়াতি। জালিয়াতিরও একটা চৌহদ্দি থাকা দরকার!

একটা মজার তথ্য :

লা-মাযহাবীদের হাত বাঁধা সম্পর্কে একটা মজার তথ্য হচ্ছে, তারা সবাই কিন্তু এক জায়গায় হাত বাঁধে না। একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ করলেই তাদের এই প্রভেদটি আপনার সামনে উন্মোচন হবে। কেউ হাত একেবারে গলদেশের নিচে বাঁধে। কেউ তার চেয়ে একটু নিচে। অনেকেই আরো একটু নিচে। মোটকথা, এক ইমামের পেছনে যদি চারজন লা-মাযহাবী থাকে, তাদের প্রত্যেকের হাত বাঁধার ধরন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা এবং ভিন্ন হবে। অথচ সারা বিশ্বের মুসলমানরা নামাযে শুধুমাত্র দুই পদ্ধতিতেই হাত বেঁধে থাকে। নাভির নিচে অথবা নাভির ওপরে।

উম্মাহর সংহতিতে কেন ফাটল ধরানোর অপপ্রয়াস?

লা-মাযহাবী ভায়েরা পারিপার্শ্বিক সব কিছু মাথা থেকে ঝেড়ে আন্তরিকতার সাথে একটু বলবেন কি, নামাযে হাত বাঁধা সম্পর্কীয় একটা মুস্তাহাব তথা-উত্তম অনুত্তমের মাসআলা নিয়ে এত তুলকালাম, বাদানুবাদ? ধর্মের জন্য এটাই কি আপনাদের শ্রেয়োবোধের প্রোজ্জ্বল নমুনা? উম্মাহর মাঝে ইস্পাতকঠিন সংহতি প্রতিষ্ঠায় যেখানে আমরা আদিষ্ট, সেখানে তাদের সংহতি এবং ঐক্যকে শাঁখের করাত দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করা হচ্ছে কার ইশারায়? এখানে অনুঘটকের ভূমিকায় কারা? কারা এর কলকাটি নাড়ছে? আপনাদের এই অপতৎপরতার পেছনে রূপকথার হ্যামিলিওনের সেই বাঁশিওয়ালার মধুর সুরের মতো কোনো কিছু নেই তো? আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন কী?

নামাযে হাত কোথায় বাঁধবে? এ বিষয়ে মতভেদটা স্রেফ উত্তম-অনুত্তম নিয়ে।

বর্তমানে এই বিষয়টি একটি স্পর্শকাতর ইস্যু হিসেবে সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের যে কর্মপদ্ধতি, তথা নাভির নিচে হাত বাঁধা, তা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ ইবনে খোযায়মা শরীফে একটি সহীহ মরফু, মুত্তাসিল হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) (تحت السرة) নাভির নিচে হাত বেঁধেছেন। فوق السرة তথা নাভির ওপর হাত বাঁধা সম্পর্কীয় তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলো নিয়ে লা-মাযহাবীরা অত্যন্ত আত্মপ্রসাদে ভুগে থাকেন। তারা তো সাধারণত হাদীসের চেয়ে হাদীসের বর্ণনাকারীদের তুলোধুনো করতে বেশি ভালোবাসেন, সে হিসেবে এই তিন হাদীসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কেও তাদের আলোচনা করা দরকার ছিল, কিন্তু এই তিন হাদীসের রাবী সম্পর্কে তাদের কোনো পুরোধাই মুখ খোলেননি।

দেখা যাক এসব হাদীসের বর্ণনাকারীদের অবস্থা :

মুয়াম্মাল, এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী। রাবীদের জীবনচরিতসম্বলিত বিভিন্ন গ্রন্থে তার জীবনী সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বোখারী (রহ.)-এর মন্তব্য হচ্ছে, তিনি মুনকিরুল হাদীস এবং ওয়াহী। তথা তিনি অনির্ভরযোগ্য এবং অতি দুর্বল প্রকৃতির। প্রখ্যাত এক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, মুয়াম্মালের মৃত্যুর পর তার কবরের এপিটাফে এই কথাটি লেখা ছিল, كان كذابا অর্থাৎ সে মিথ্যুক ছিল। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের উক্তিগুলো সংকলন করলেও একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের জন্ম হবে। অথচ লা-মাযহাবীদের ঝুলিতে নাভির ওপর হাত বাঁধা স্বপক্ষে এই তিনটি হাদীস ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নেই। আমি হাত বাঁধা সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য পুস্তিকা নিয়ে এসেছি, সেটাতে অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। সংগ্রহ করলে অনেক উপকার হবে।

আরেকটি পয়েন্ট : এক মুহাদ্দিসের অনেক ছাত্র-সতীর্থ থাকে। মুয়াম্মালের যত সতীর্থ ছিল, তাদের কারো বর্ণনায় على صدره (বুকের ওপর) শব্দটি নেই। অনেকের বর্ণনায় وضع هذه على هذه রয়েছে। আরবি ব্যাকরণানুযায়ী هذه স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার হয়। তাই هذه থেকে صدر কোনোক্রমেই উদ্দেশ্য হতে পারে না। বরং هذه থেকে يد উদ্দেশ্য হবে। যেহেতু صدر শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং هذه শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবেই আরবী ভাষাভাষীদের থেকে শ্রুত।

আল্লামা নীমভী (রহ.) বলেন, على صدره যারা সংযোজন করেছেন। তা সংরক্ষিত নয়।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, আসলে হাদীসের শব্দ হচ্ছে على هذه কিন্তু এটাকে মুয়াম্মালের কোনো ছাত্র على صدره হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীসের পরিভাষায় যাকে 'তাসহীফ' (লেখার মধ্যে ইচ্ছা করে ভুল করা) বলা হয়। এ জন্য রাসূলের স্বর্ণালি যুগ থেকে লা-মাযহাবীদের পূর্ব পর্যন্ত কোনো ইমাম على صدره তথা বুকের ওপর হাত বাঁধাকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেননি, বরং তারা নাভির নিচে অথবা নাভির ওপর হাত বাঁধাকেই সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সংযোজনটি সম্পূর্ণ ভুল ছিল।

এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে, একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর ভুল সংযোজনের ওপর ভিত্তি করে যারা সীনার ওপর হাত বাঁধা সম্পর্কে এত লঙ্কাকাণ্ড ঘটাচ্ছে, তাদের মতাদর্শ যে কত অন্তঃসারশূন্য এবং নড়বড়ে হবে, তা বুঝতে বৈদগ্ধময় হাদীস বিশারদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের কাছে তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

লা-মাযহাবীদের দুর্বলতা, আমাদের ব্যর্থতা :

নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পরপরই হাত বাঁধার মাসআলা। হাত সীনার নিচে বাঁধবে না বুকের ওপর বাঁধবে? এখানে লা-মাযহাবীদের অবস্থান অত্যন্ত নড়বড়ে। শক্ত করে একটু নাড়া দিলেই মুহূর্তেই তারা কুপোকাত। কারণ সীনার ওপর হাত বাঁধা সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই তাদের কাছে। এখানেই লা-মাযহাবীদের যত ব্যর্থতা : কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা কোথায় জানেন? কোনো লা-মাযহাবী যখন আমাদের কাছে বাদানুবাদের জন্য আসে, সর্বপ্রথম তার আলোচনা শুরু হয় রফয়ে ইয়াদাইন নিয়ে। আমরাও জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে অবচেতনাবস্থায় তাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি। এখানেই আমাদের ব্যর্থতা। আমাদের উচিত তাকে সুস্থিত করে জিজ্ঞেস করা, নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পর হাত বাঁধার মাসআলা, না রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা? আপনি এক লাফে হাত বাঁধার পর্ব বাদ দিয়ে রফয়ে ইয়াদাইনে চলে গেলেন যে? প্রথমে বোখারী শরীফ দ্বারা প্রমাণিত করুন, নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পর হাত কোথায় বাঁধবে? তারপর না হয় রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে আপনার বক্তব্য শুনব। এ কথা বলার পর তার চেহারার ওপর স্মিত হাসির যে রেখাটি ছিল, তা নিমিষেই মুছে যাবে। তার মুখাবয়বে ফুটে উঠবে অমাবস্যার অন্ধকার। কিছুক্ষণ পূর্বেও যার অন্তরে ছিল আপনাকে সঠিক পথের(?) দিশা দেওয়ার অনির্বচনীয় আকাঙ্ক্ষা, সে ব্যক্তিই সর্বান্তকরণে এখন প্রার্থনা করবে, সে যেন যেকোনো প্রকারে আপনার হাত থেকে বাঁচতে পারে।

বোখারী শরীফে হাত বাঁধার মাসআলা :

আপনি তাকে এ কথাটি জানাতে পারেন,

বোখারী শরীফে এতটুকু আছে, يضع هذه على هذه এই হাতকে এই হাতের ওপর রাখবে। কিন্তু রাখার পর হাত বাঁধবে কোথায়? এ সম্পর্কে বোখারী শরীফে কোনো আলোচনাই নেই। এখন স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি আসে, তা হচ্ছে, ইমাম বোখারী (রহ.) কোথায় হাত বাঁধতেন? স্পষ্ট কথা হচ্ছে, ইমাম বোখারী (রহ.) যদি হাম্বলী অথবা শাফেয়ী মাযহাবানুসারে নামায পড়লে নাভির ওপর হাত বাঁধতেন। তার আমল যদি সীনার ওপর হাত বাঁধা হতো, তাহলে তার মতের স্বপক্ষে কোনো হাদীস বোখারী শরীফে উল্লেখ করলেন না কেন? ইমাম বোখারী (রহ.) যদি على صدره এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় পেতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি ওই হাদীস বোখারী শরীফে উল্লেখ করতেন।

লা-মাযহাবীদের গোড়ায় গলদ :

বোখারী শরীফে না থাকলে ওই হাদীস আমলযোগ্য নয়। লা-মাযহাবীদের এ ধরনের চিল্লাচিল্লিতে আমাদের মতো নিরীহ মুসলমানদের জান যায়, যায় অবস্থা। বড় কষ্ট আর নিদারুণ দুঃখে কালাতিপাত করছি আমরা। আমরা তাদের সামনে কোনো হাদীস উপস্থাপন করলেই সাথে সাথেই কী ভয়ানক হুংকার, এই হাদীসটি বোখারী শরীফে নেই, বিধায় আমলযোগ্য নয় (!)

কিন্তু আপনারা শুনে অবাক হবেন, যে বোখারী শরীফ নিয়ে তাদের এত আস্ফালন এবং দম্ভ, সে বোখারী শরীফ কিন্তু তাদেরকে চরমভাবে হতাশ করেছে। কারণ নামাযে তাকবীরের পরেই যে হাত বাঁধার মাসআলা, সে সম্পর্কে বোখারী শরীফে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। আমি প্রায় সময় বলি, যাদের গোড়ায় গলদ, তাদের দ্বারা পৃথিবীতে গলদ ছাড়া আর কী-ই বা হবে?

আমাদের অত্যন্ত সুহৃদ এক মুফতী সাহেবের ঘটনা :

মুফতী আব্দুল আযিয, আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাজন লোক। এসব কাজে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সত্যিই বিস্ময়কর। লা-মাযহাবীরা তাকে উত্তেজিত করার জন্য জনাকয়েক তরুণকে তার কাছে পাঠাল। তিনি অত্যন্ত সুস্থিরভাবে তাদের বক্তব্য আদ্যেপান্ত শুনলেন। এরপর তাদের হাতে বিশ হাজার রুপি এবং এক সেট বোখারী শরীফ দিয়ে বললেন, তোমাদের দীর্ঘ এক সপ্তাহ সময় দিলাম। এই এক সপ্তাহে তোমরা বোখারী শরীফ থেকে শুধুমাত্র একটা সহীহ হাদীস বের করে দেবে। সীনার ওপর হাত বাঁধা সম্পর্কীয় শুধুমাত্র একটা সহীহ হাদীস। যদি এই সাধারণ (!) কাজটা করতে পারো, তাহলে কেল্লাফতে! বিশ হাজার রুপি এবং বোখারী শরীফের সেটটা হাদিয়াস্বরূপ আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব। আর যদি বের করতে অক্ষম হও, তাহলে ওই আলেমকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, যে তোমাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। এ যুবকদের অবস্থা তখন অত্যন্ত করুণ। উপয়ান্তর না দেখে তারা ওই রুপি, বোখারী শরীফসহ গেলেন তাদের সবজান্তা (!) পুরোধার কাছে, যিনি তাদেরকে এই গ্যাড়াকলে ফেলেছেন। তাদের হাতে রুপি এবং বোখারী শরীফ দেখে ওই মাওলানার চক্ষু চড়কগাছ। যেহেতু কাজটি কস্মিনকালেও সম্ভবপর নয়। কারণ বোখারী শরীফে ওই বিষয়ে হাদীসই নেই। শেষ পর্যন্ত তারা লজ্জার মাথা খেয়ে বিশ হাজার রুপি এবং বোখারী শরীফটা ফেরত দিয়ে দিল। তবে এর মাধ্যমে তরুণদের জন্য সত্য-মিথ্যার পরিচয়টা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। তারা লা-মাযহাবীদের অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে আমাদের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করল।

প্রকৃত আহলে হাদীস কারা?

লা-মাযহাবীরা নিজেদেরকে আহলে হাদীস হিসেবে পরিচয় দিতে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কিন্তু প্রকৃত আহলে হাদীস কারা? এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করছি। স্বর্ণালি যুগ থেকে অদ্যবধি ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারীরা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হিসেবেই পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের এই নামকরণের পেছনে কুরআন-হাদীসের প্রমাণাদি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই নামের একটা নিগূঢ় রহস্য হচ্ছে, ইসলাম ধর্মে শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্বের যত গুণাগুণ এবং বিশ্লেষণ রয়েছে, এরাই মূলত সবগুণেই ঋদ্ধ হওয়ার যোগ্য। হাদীস শরীফের একটা বাণী লক্ষ করুন, اوتروا يا اهل القرآن উক্ত হাদীসে আহলে কুরআন থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাদেরকে এখানে আহলে কুরআন হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে।

এখন আমরা এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, আমরাই আহলে কুরআন, আমরাই আহলে হাদীস। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে এই নামে পরিচয় দিই না। আর যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস হিসেবে পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদে ভোগেন, তারা মূলত আহলে হাদীস নয়। এটাকে বলা হয় শুভঙ্করের ফাঁকি। বাহ্যিক দেখতে এক রকম, ভেতরে অন্য রকম। কারণ তাদের ভেতর-বাহির এক নয়। তারা নিজেদেরকে পরিচয় দিচ্ছে আহলে হাদীস হিসেবে! কিন্তু হাদীসের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা কতটুকু? তা পর্যালোচনা করা যাক।

হাদীসের বহুমাত্রিক সেবায় মুকাল্লিদ বনাম গায়রে মুকাল্লিদ :

এ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, হাদীস শরীফের বহুমাত্রিক সেবা, প্রচার-প্রসারে আমাদের (মাযহাবানুসারী) যে অহর্নিশি পরিশ্রম, দিবানিশি অক্লান্ত মেহনত-মোজাহাদা, তাকে যদি কথিত আহলে হাদীসের তৎপরতার সাথে

তুলনা করা হয়। তা কেমন হবে? তা হবে মহাসমুদ্রের এক ফোঁটা পানির সমতুল্য। মহাসমুদ্রের সমস্ত পানির সামনে এক ফোঁটা পানি যেমন মূল্যহীন, হাদীসের সেবায় আমাদের সামগ্রিক অবদানের সামনে তাদের অবদানের অবস্থাও তথৈবচ। এ কোনো কল্পনাপ্রসূত কিংবা আবেগতাড়িত আষাঢ়ে গল্প নয়। বরং বাস্তবতার যথার্থ মূল্যায়ন মাত্র। আমি প্রায় সময় বলে থাকি, আমাদের উপমহাদেশ তথা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে এমন অগুনতি মাদরাসা রয়েছে, যেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সব গ্রন্থের পাঠদান করা হয়। তন্মধ্যে বোখারী মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, তহাভী শরীফ শরীফ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, মিশকাতুল মাসাবীহ প্রভৃতি অন্যতম। পাঠদান করা না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন তালিকায় আরো রয়েছে মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, কিতাবুল আছার লিল ইমামিল আজম, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, সহীহ ইবনে খোযাইমা, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, মুসতাদরাকে ইমাম হাকেম দারে কুতনী, দায়লমী, সহীহ ইবনে হিববান, হিলয়াতুল আওলিয়া, দালায়িলুন নুবুওয়াহ, সুনানে দারেমী, সহীহ ইবনে আওয়ামা, মাজমাউয যাওয়াইদ, কানযুল উম্মাল, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী প্রভৃতি হাদীসের বিশাল বিশাল ভাণ্ডার। আর আজ পর্যন্ত হাদীসের বহুমাত্রিক সেবায় মুকাল্লিদদের অবিস্মরণীয় অবদান ইতিহাসের আরেক দীপিত অধ্যায়। হাদীসের মূল ইবারত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, শাব্দিক অর্থ, উত্থাপিত আপত্তির নিষ্পত্তি, হাদীসের বাহ্যত বিরোধ নিরসন, মোট কথা হাদীসের যত প্রকার সেবা হতে পারে, সবক্ষেত্রে তাদের দীপ্ত পদচারণ হাদীসের এই অমূল্য ভাণ্ডারকে করেছে আরো ঋদ্ধ এবং সমৃদ্ধ। পূর্বযুগ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে, পরিভাষায় যা 'তবকাত' নামেই সর্বাধিক সমাদৃত তবকাতে হানাফিয়্যাহ, তবকাতে শাফেয়ীয়াই, তবকাতে মালেকীয়াহ, তবকাতে হাম্বলীয়াহ আসমাউর রিজালের (জীবনচরিত) অনেক বড় অংশজুড়েই ব্যাপৃত। গর্ব কিংবা দম্ভোক্তি নয়, মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলছি, তৎকালীন যুগেও হাদীসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন প্রতিভাশাণিত এবং যুগের সপ্রতিভ আমাদের পূর্বসূরিরা। বর্তমানেও এই গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দানে আমরাই অগ্রসেনানী। লা-মাযহাবীদেরকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, পুরো উপমহাদেশে তোমাদের একটা এমন প্রতিষ্ঠান দেখাও, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের গ্রন্থসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠদান করা হয়। মতবিরোধপূর্ণ কয়েকটি রেওয়াত ব্যতীত কি অন্য কোনো হাদীস নেই? না হলে তোমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহে ওই সব রেওয়াত ব্যতীত অন্য হাদীসের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণের হেতু কী? জানতে পারি কি?

লা-মাযহাবীদের দ্বিমুখী নীতি :

আপনাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, অনুসরণ করা যাবে শুধুমাত্র রাসূল (সা.) কে, অন্য কেউ কখনো অনুসরণযোগ্য নয়। আপনাদের ভাষায়, মুকাল্লিদরা অন্য লোকের অনুসরণ করে থাকে, তাই তারা মুশরিক। কিন্তু প্রমাণাদি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আপনারা রাসূল (সা.) থেকে একেবারে ইবনে হাজর (রহ.) পর্যন্ত নেমে আসেন কেন? মুখে এক কথা, আচার-ব্যবহারে তার বিরোধিতা, এটা তো সৎ পন্থা নয়। মুহাদ্দিসীনদের মতামতকে রাসূলের বাণী হিসেবে চালিয়ে দিতে একটুও বুক কেঁপে ওঠে না? আর লা-মাযহাবীদের দৌড়ঝাঁপ শেষ হয় ইবনে হাজর (রহ.) পর্যন্ত গিয়ে।

আমি বলে থাকি, আমাদের দৌড় ইবনে জবল পর্যন্ত, আর তোমাদের দৌড় ইবনে হাজর পর্যন্ত। আমাদেরকে ইবনে জবলের স্তর থেকে নিচে আসার প্রয়োজন হয় না। এখন ইনসাফের সাথে বলুন, ইবনে জবলের মর্যাদা বেশি, না ইবনে হাজরের? তুলনা করাটাই নিরর্থক এবং নিষ্প্রয়োজন। কোথায় রাসূলের প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জবল (রা.), আর কোথায় একজন মুহাদ্দিস ইবনে হাজর? এখন আমাদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা করাটাও তো ভুল। কারণ তোমাদের গুরু ইবনে হাজর আর আমাদের সর্বশেষ পুরোধা ইবনে জবল।

মোটকথা, হাদীসের সেবাই আলহামদুলিল্লাহ আমরাই অগ্রগামী। হাদীসের পূর্ণাঙ্গ পাঠদান আমরাই করি। যেসব হাদীসের ওপর বাহ্যত আমরা আমল করি না, তার অর্থ এটা নয় যে, আমরা ওই সব হাদীসকে অস্বীকার করি। বরং আমরা এসব হাদীসের 'তাতবীক' (সামঞ্জস্যতা) অথবা 'তাবীল' (ব্যাখ্যা) পেশ করে থাকি। অন্যদিকে লা-মাযহাবীরা হাদীসের একটা শব্দ নিয়ে নিজেদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রমাণ করতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাবে, (শব্দটি হাদীসে স্পষ্টভাবে না থাকলেও শব্দটিকে হাদীসের অংশ হিসেবে চালিয়ে দিতে তারা অত্যন্ত পটিয়স) আর এর বিপরীত যত হাদীস থাকবে, সব হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করতে তাদের একটুও কুণ্ঠাবোধ হবে না।

আলহামদুলিল্লাহ! এত দিন পর্যন্ত লা-মাযহাবীদের সাথে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে (আগামী সংখ্যা থেকে) গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের ওপর বিষয়ভিত্তিক কিছু আলোকপাত করা হবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী।

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-৬

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

তাকলীদের ভুল ব্যাখ্যা

ডা. জাকির নায়েক তাকলীদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন-

تقلید وہ کھتے ہے کہ آنکھ بند کر ماننا

"চোখ বন্ধ করে অনুসরণকে তাকলীদ বলে।"

http://www.youtube.com/watch?v=leuNHQR7POI

اگر وہ انسان جس کے بات مانتے ہیں، اس کے خلاف ثبوت پیش کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں، پھر بھی آپ اس کے بات مانتے ہیں اسے کہتے ہیں تقلید

"আপনি যাকে অনুসরণ করছেন তার বিরুদ্ধে যদি কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণ পেশ করা হয়, তার পরও যদি আপনি তাকে অনুসরণ করেন, তবে একে বলা হবে তাকলীদ।"

What is Taqleed _ Taqleed kia hai _ By Dr.Zakir Naik in Urdu - YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=leuNHQR7POI

ডা. জাকির নায়েক তাঁর এ বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন-

مطلب ایک آدمی قرآن وحدیث میں اسکالر ہیں اس نے فتوی دیا آپنے اس کے بات مان لی؛ ٹھیک ہے آپ تو عام آدمی ہے . قرآن میں ہے :فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "اس سے پوچھو جس کے پاس علم ہے . آپ نے پوچھا اور اسکے بات مان لیا اسے تقلید نہیں کہتے ہے لیکن دوسرا کہتا ہے : جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوی قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، پھر بھی آپ ... نہی - نہی وہ بڑا عالم ہے میں اس کے بات مانوں گا . حوالہ ملنے کے بعد، ثبوت ملنے کے بعد قرآن اور حدیث کے روشنی میں، پھر بھی آپ اس عالم کی بات مان لے اسے کہتے ہیں تقلید

"উদ্দেশ্য হলো, এক ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসের ওপর দক্ষ। তিনি কোনো ফতওয়া প্রদান করার পর আপনি তার কথা গ্রহণ করলেন। ঠিক আছে! কেননা আপনি সাধারণ মানুষ। কুরআনে আছে, "যার নিকট ইলম আছে, তার নিকট জিজ্ঞাসা করো। আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তার কথা মেনে নিলেন, একে তাকলীদ বলে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, যে আলেমের নিকট আপনি গিয়েছেন, তার ফতওয়া কুরআন ও হাদীসের বিপরীত তবুও আপনি বললেন- না-না, তিনি বড় আলেম, আমি তাকে অনুসরণ করব, তবে এ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের আলোকে কারও বিপরীতে প্রমাণ পাওয়ার পর এবং তার ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে অনুসরণ করার নাম হলো তাকলীদ।

ডা. জাকির নায়েক "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে বলেছেন-

What's the meaning of Taqlid? Taqlid means... Following the opinion of the scholar dose not make you in the format of Taqlid, dose not make you Muqallid. If after showing proof that the scholar you are following is wrong and then you follow him. Yes, that makes you a Muqallid.

"তাকলীদের অর্থ কী? তাকলীদের অর্থ হলো, কোনো স্কলারের বক্তব্য গ্রহণ করা আপনাকে মুকাল্লিদ বানাবে না। আপনি যাকে অনুসরণ করছেন তাকে ভুল প্রমাণিত করার পরও যদি আপনি তার অনুসরণ করেন তাহলে এটিই আপনাকে মুকাল্লিদ বানাবে।"

ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, (unity, part-3, 4.49), http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

ডা. জাকির নায়েক এখানে তাকলীদের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন পৃথিবীর কেউ তাকলীদের এ ধরনের সংজ্ঞা দেয়নি। কেননা কারও ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে তার সে বিষয়টি অনুসরণ করা জায়েয নয়। চার ইমাম বা অন্য কোনো মুজতাহিদ যদি ভুল করেন এবং সেটি যদি সুস্পষ্টভাবে ভুল প্রমাণিত হয়, তবে তার সে ভুল বিষয়টির ওপর আমল করা অন্যদের জন্য জায়েয নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। ইসলামী শরীয়তে ভুলের অনুসরণকে বৈধ বলা হবে এটি কল্পনা করাও অসম্ভব।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ভুল "প্রমাণিত" হওয়া আবশ্যক। এখন যে কেউ তার মতের বিরুদ্ধে কোনো মাসআলা পেল আর সাথে সাথে সে বলে দিল যে, এটি ভুল, কারও এ ধরনের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়টি বর্তমানে অধিকাংশ লা-মাযহাবীদের মাঝে দেখা যায়, তারা কোনো একটি মাসআলা তাদের মতের বিরুদ্ধে গেলেই বলে দেয় যে, এটি ভুল। অমুক ইমাম এটি ভুল করেছেন। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ ভুলটি সংশ্লিষ্ট আলেমের নয়, তার নিজের বুঝের ভুল। নিজের অজ্ঞতাকে সে আলেমের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমানে এ রোগটি এতটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, একে দূরারোগ্য ব্যাধি বললে ভুল হবে না।

শরীয়তের বিষয়ে সামান্য জ্ঞান রাখে না এমন ব্যক্তিরা দু-একটি বই পড়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় যে, ইসলামে অমুক অমুক ভুল আছে, বড় বড় ইমামগণ অমুক অমুক ভুল করেছেন। এগুলো সংশোধন করা আবশ্যক। বর্তমান সময়ে এ ধরনের মূর্খ গবেষকদের অভাব নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কাজী জাহান মিয়া তার "আল কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ, সমকাল পর্ব-১ এ ইয়াজুজ মা'জুজ দ্বারা বর্তমান সময়ে গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকাকে উদ্দেশ্য নিতে গিয়ে ইয়াজুজ মা'জুজসংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের সকল বর্ণনা অস্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন-

"প্রচলিত ধারণায় ইয়াজুজ-মাজুজের পৃথিবীতে আগমন (মডেল)। কোরআনের ব্যাখ্যাকারী ও হাদীস বেত্তাগণ একটি অতি প্রাকৃতিক উদ্ভট জীবের কল্পনা করেছেন, যারা মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করার প্রত্যয়ে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করবে। ধারণাটি মিথ্যা। কোরআনের ভুল ব্যখ্যা কোরআনের ওপর কোনো দায় সৃষ্টি করে না। দায়টি ব্যাখ্যাকারীদের-ই মাত্র।" (আল কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ, সমকাল পর্ব, পৃষ্ঠা-৬৬, মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত।)

কুরআন ও হাদীসের সমস্ত প্রমাণকে মিথ্যা বলে নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত, ভ্রান্ত, মনগড়া একটা বিষয় প্রমাণ করার চেষ্টা করাটাও কুরআন ও সুন্নাহের ওপর কোনো দায় সৃষ্টি করবে না, দায়টি কুরআন ও সুন্নাহ অস্বীকারকারীর ওপরই বর্তায়। এভাবে নিজের অজ্ঞতা আর মূর্খতাকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার যে দূরারোগ্য ব্যাধি আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে, আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তা থেকে হিফাজত করুন।

একটা বিষয় হলো নিজের ভুল হওয়া, আরেকটা হলো মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন উপায়ে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া। দ্বিতীয়টি অমার্জনীয় অপরাধ। মুসলমানদের এসব বিষয় খুবই সতর্কভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

আমাদের আলোচনার বিষয় হলো তাকলীদ। ডা. জাকির নায়েক এখানে তাকলীদের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এ ধরনের সংজ্ঞা পৃথিবীর কেউ দেয়নি। বরং এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সুস্পষ্টভাবে কারও ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর ভুল বিষয়ে অন্যের অনুসরণ করা জায়েয নয়।

তাকলীদের প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি। অতএব এ থেকে স্পষ্ট হবে যে, ডা. জাকির নায়েক যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন সেটি সুস্পষ্ট ভুল। আর এ ভুল মূলত শরীয়তের বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান না থাকার কারণেও হতে পারে। আবার পরিকল্পিত মিশনও হতে পারে।

তাক্বলীদ আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো, কোনো বস্তুকে গলায় পেঁচিয়ে রাখা। আর যে বস্তুকে গলায় পেঁচানো হয়, তাকে "ক্বিলাদা" বলে।

তাকলীদের পারিভাষিক অর্থ :

তাকলীদের পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম একই ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে একটা সংজ্ঞার সাথে অন্য সংজ্ঞার কিছু তারতম্য রয়েছে। এখানে আমরা তাকলীদের তিনটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করব।

তাকলিদের প্রথম সংজ্ঞা

আল্লামা আ'মাদী (রহ.) তাকলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة

অর্থাৎ আবশ্যক কোনো দলিল ব্যতীত অন্যের কথার ওপর আমল করা।

[আল-ইহকাম, খ. ৪, পৃষ্ঠা-২২১]

এখানে "আল-আমালু বি কওলিল গায়ের" (অন্যের কথা অনুযায়ী আমল) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার কথা সঠিক হওয়ার বিশ্বাস রেখে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। "কাওল" (কথা) দ্বারা অন্যের কথা ও কাজ দু'টিই অন্তর্ভুক্ত হবে। এটি আল্লামা তাফতাযানী (রহ.)-এর অভিমত।

এখানে "হুজ্জাত" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন দলিল, যা গ্রহণ ও যার ওপর আমল করা আবশ্যক। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা। অতএব এই শর্তের দ্বারা যে সমস্ত ক্ষেত্রে হুজ্জাত পাওয়া যাবে, সে ক্ষেত্রে তার অনুসরণ তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন-

১. আল্লাহর কথা অনুযায়ী আমল করা। কেননা এখানে আল্লাহর কথা অনুযায়ী আমল করার হুজ্জাত হলো, সে সমস্ত দলিল, যা আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলসমূহের প্রতি এবং তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশনা প্রদান করে। সুতরাং আল্লাহর কোনো নির্দেশের ওপর আমল করা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. রাসূলের কথা অনুযায়ী আমল করা। এটিও তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এখানে "হুজ্জাত" হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের কথা গ্রহণের কথা নির্দেশ দিয়েছেন।

৩. "মুসলিম উম্মাহর ইজমার ওপর আমল করা।" এটি তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এদের ঐকমত্যের ওপর আমলের নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাহে রয়েছে।

৪. কাযীর জন্য সাক্ষীর কথা অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া। এটি তাকলীদ নয়। কেননা সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে সাক্ষীর কথা গ্রহণের নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাহে রয়েছে এবং এর ওপর ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৫. মুফতীর ফতওয়ার ওপর "সাধারণ মানুষের" আমল। এটিও তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এ বিষয়ে শরীয়তের "হুজ্জত" রয়েছে। আর তা হলো, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহের "ইজমা" সংগঠিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ প্রয়োজন হলে মাসআলার জন্য ফতওয়া প্রদানকারীর শরণাপন্ন হবে।

এবং মুফতীর ফতওয়া অনুযায়ী আমল করা তার ওপর আবশ্যক হবে। এখানে হুজ্জত হলো, মুসলিম উম্মাহের ইজমা। এ ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহে এ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে।

৬. হাদীস বর্ণনাকারীর (রাবী) নিকট থেকে "আমলযোগ্য" কোনো হাদীস গ্রহণ করে তার ওপর আমল করলে সেটা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এখানে "হুজ্জত" হলো, আল্লাহর রাসূল আদেশ করেছেন, "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও এবং উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দাও।

৭. কোনো সাহাবীর এমন বক্তব্য, যার সাথে অন্য সাহাবীগণ বিরোধিতা করেননি, তার ওপর আমল করাও তাকলীদ নয়। কেননা এ ব্যাপারে শরীয়তের হুজ্জত রয়েছে।

একই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আল্লামা ইবনে আব্দুশ শুকুর "মুসাল্লামুস সুবুত" নামক কিতাবে। আল্লামা ইয্যুদ্দিন শরহে মুখতাসারে ইবনে হাজেবে এ ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

আল্লামা ইবনে হাজেব (রহ.) তাকলীদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন-

" العمل بقول غيرك من غير حجة

"অর্থাৎ আবশ্যক দলিলবিহীন অন্যের কথা অনুযায়ী আমল করা।"

[শরহে মুসাল্লামুস সুবুত, খ.২, পৃষ্ঠা-৪০০]

১. ইমাম গাজালী (রহ.) "মুসতাসফা" নামক কিতাবে লিখেছেন,

قبول قول بلا حجة

"হুজ্জতবিহীন কোনো কথা গ্রহণ করা হলো তাকলীদ।"

[আল-মুসতাসফা, খ. ২, পৃষ্ঠা-১২৩]

২. আল্লামা ইবনে কুদামা লিখেছেন,

قبول قول الغير من غير حجة

"হুজ্জত ছাড়া অন্যের কথা গ্রহণ করা হলো, তাকলীদ"[রওযাতুন নাজের, পৃষ্ঠা-২০৫]

মৌলিক দিক থেকে এ সংজ্ঞাগুলো এবং পূর্বোক্ত আল্লামা সাইফুদ্দিন আ'মাদী (রহ.)-এর সংজ্ঞার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এ সংজ্ঞাগুলো থেকে তাকলীদ সম্পর্কে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

১. শরীয়তের বিষয়ে "আমী" (যে মুজতাহিদ নয়), তারই সমশ্রেণীর আরেকজন "আমীর" কথা অনুযায়ী আমল করা।

২. একজন মুজতাহিদ আলেম আরেকজন মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী আমল করা; আমলকারী মুজতাহিদ এ ক্ষেত্রে ইজতেহাদ করুক বা না করুক।

৩. মুজতাহিদ নয় এমন কোনো ব্যক্তির কথা অনুযায়ী কোনো মুজতাহিদ আমল করা।

তাকলীদের দ্বিতীয় সংজ্ঞা :

আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহ.) "জামউল জাওয়ামে" নামক কিতাবে তাকলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন,

" أخذ القول من غير معرفة دليله

"অর্থাৎ দলিল সম্পর্কে অবগত না হয়ে অন্যের কথা গ্রহণ করা।"

এখানে "অন্যের কথা গ্রহণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অন্যের কথা সঠিক হওয়ার বিশ্বাস রেখে তার ওপর আমল করা।"

[জামউল জাওয়ামে' খ. ২, পৃষ্ঠা-৪৩২]

"দলিল সম্পর্কে অবগত না হয়ে" এ কথার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করতে গিয়ে জালাল আল-মাহাল্লী "জামউল-জাওয়ামে"-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন,

"দলিল সম্পর্কে অবগত হওয়ার অর্থ হলো, কিভাবে দলিল থেকে মাসআলা বের করা হয়, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া। এটি মুজতাহিদ ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা প্রথমত দলিলটি দলিল হওয়ার জন্য তার প্রতিবন্ধক (*عارض*) বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি। আর দলিলের সব ধরনের ত্রুটি ও প্রতিবন্ধক বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি আনুষঙ্গিক সমস্ত দলিল সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সে সম্পর্কে গবেষণার ওপর নির্ভর করে। আর এ ধরনের গবেষণা করা মুজতাহিদের কাজ। কেননা শরীয়তের বিষয়ে "আমী" (মূর্খ) ব্যক্তি সে স্তর পর্যন্ত উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।"

১. আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহ.)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন সাধারণ ব্যক্তি যদি কোনো মুজতাহিদ আলেমের কথা গ্রহণ করে, তবে সেটা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু আল্লামা আ'মাদী (রহ.) যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী একজন সাধারণ ব্যক্তির জন্য কোনো মুজতাহিদের অনুসরণের বিষয়টি তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, বরং সাধারণ ব্যক্তি যদি কোনো মুজতাহিদ পর্যন্ত সরাসরি পৌঁছতে না পারে, তখন সে মাসআলার ক্ষেত্রে "মুফতীর" কাছ থেকে ফতওয়া নেবে। আর এ ধরনের ফতওয়া নেয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুজ্জাত আছে। সুতরাং আল্লামা আ'মাদীর নিকট এটি তাকলীদ নয়। কিন্তু আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহ.)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সাধারণ মানুষ দলিল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে অক্ষম।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তাঁর বিখ্যাত উসুলের কিতাব "মুসাওওয়াদা" তে লিখেছেন,

القول بغير دليل"

"দলিল ছাড়া কোনো কথা গ্রহণ করা"

২. শায়খ যাকারিয়া আনসারী "গায়াতুল উসূল" নামক কিতাবে লিখেছেন,

" أخذ قول الغير من غير معرفة دليله

৩.আবু বকর আশ-শাশী (রহ.) লিখেছেন,

"قبول قول القائل، وأنت لا تدرى من أين قاله "

"তাকলীদ হলো, অন্যের কথা গ্রহণ করা, অথচ সে কোথা থেকে বলেছে, তা তুমি জান না।"

এ সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে আক্ষরিক পার্থক্য থাকলেও মৌলিক দিক থেকে এগুলোর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

এ সমস্ত সংজ্ঞা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে-

১. শরীয়তের বিষয়ে মুজতাহিদ নয় (আমী), এমন ব্যক্তির কথা আরেকজন "আমী" গ্রহণ করা।

২. কোনো মুজতাহিদ সংশ্লিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতেহাদ না করে, অন্য একজন মুজতাহিদের ইজতেহাদের ওপর আমল করা।

৩. মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তি (আমী) কোনো মুজতাহিদ আলেমের তাকলীদ করা।

৪. কোনো মুজতাহিদ কোনো "আমীর" কথার ওপর আমল করা।

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো মুজতাহিদ যদি অন্য মুজতাহিদের মতের সাথে তার দলিল সম্পর্কে অবগত তার কথা অনুসরণ করে, তবে সেটা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আমরা তাকলীদের দ্বিতীয় যে সংজ্ঞা দিয়েছি, এ সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় না যে, কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার কোনো বিষয় গ্রহণ করা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত কি না? প্রথম সংজ্ঞায় এ বিষয়গুলো এবং আরও কিছু বিষয়ের অনুসরণ তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমরা তাকলীদের তৃতীয় আরেকটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব, যেখান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

তাকলীদের তৃতীয় সংজ্ঞা

তাকলীদের তৃতীয় সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ.) তাঁর "তাহরীর" নামক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন,

العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها "

"অর্থাৎ তাকলীদ হলো, দলিলবিহীন এমন ব্যক্তির কথার ওপর আমল করা, যার কথা 'শরীয়ত স্বীকৃত কোনো দলিলের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

এখানে "শরীয়ত স্বীকৃত 'হুজ্জত' বা দলিলের অন্তর্ভুক্ত নয়" এ কথার দ্বারা কুরআনের ওপর আমল করা, রাসূলের সুন্নাহের ওপর আমল করা এবং 'ইজমার' ওপর আমল করার বিষয়টি তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এগুলোর ওপর আমলের ব্যাপারে শরীয়ত স্বীকৃত নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, কাযী যখন সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেবে। এ ক্ষেত্রে সাক্ষীর কথা অনুযায়ী কাযীর ফয়সালা দেয়াটা তাকলীদ নয়। কেননা তার সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা রয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারী রাবীর নিকট থেকে "আমলযোগ্য" হাদীস গ্রহণ করলে তার ওপর আমল করাও তাকলীদ নয়। তেমনিভাবে কোনো সাহাবীর মতামতের সাথে যদি অন্য সাহাবীরা একমত হন এবং কেউ তার বিরোধিতা না করেন, তবে তার কথা অনুসরণ করাটাও তাকলীদ নয়। কেননা এ সমস্ত ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশনা রয়েছে।

কোনো সাধারণ মানুষের জন্য মুফতীর ফতওয়ার ওপর আমল করাটা তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? কিছু কিছু আলেম মনে করেন, সাধারণ মানুষের জন্য মুফতীকে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে শরীয়তের 'হুজ্জত' রয়েছে, সুতরাং এটি তাকলীদ নয়। তবে ব্যাপকভাবে উলামায়ে কেরাম একে তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ মুফতীর ফতওয়ার ওপর নির্ভর করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে।

একই ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, আল্লামা শাওকানী (রহ.) তাঁর "ইরশাদুল ফুহুল" এ-

"رأى من لا تقوم به الحجة بلا حجة

"দলিলবিহীন এমন ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা, যার কথা গ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের কোনো হুজ্জত নেই।"

সুতরাং ইতিপূর্বে কোনো আলেম ডা. জাকির নায়েক যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, এ ধরনের সংজ্ঞা দেননি। এটি ডা. জাকির নায়েকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট একটি ভুল। আর এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রাখা উচিত যে, কারও ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর সে বিষয়ে তার অনুসরণ শরীয়তে বৈধ নয় এবং একে তাকলীদও বলা হয় না

তাকলীদের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো মনে রাখা আবশ্যক-

১. দ্বীনের মৌলিক আক্বিদার ক্ষেত্রে অন্যের তাকলীদ করা বৈধ নয়।

২. অকাট্য, সুস্পষ্ট এবং মুতাওয়াতির বিষয়ের ক্ষেত্রেও অন্যের তাকলীদের কোনো সুযোগ নেই।

৩. অকাট্য দলিল যদি এমন সুস্পষ্ট হয়, যার বিপরীত কোনো দলিল নেই তবে সে ক্ষেত্রেও তাকলীদের কোনো সুযোগ নেই।

৪. যার তাকলীদ করা হয়, তাঁকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করা কিংবা তার সুস্পষ্ট ভুল বিষয়কে শুধু গোড়ামিবশত আঁকড়ে থাকা শরীয়তসম্মত নয়। ভুল যার থেকেই প্রমাণিত হোক, ভুল বিষয়ে তাকলীদ শরীয়তে বৈধ নয়।

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহের অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য কিংবা একাধিক অর্থপূর্ণ বিষয়ে কাড়িখত অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রেই কেবল তাকলীদ স্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে যারা মুজতাহিদ রয়েছেন, কেবল তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য এবং সর্বসাধারণ যারা মুজতাহিদ নয় তাদের কথা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয় বরং সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, এ সমস্ত ক্ষেত্রে মুজতাহিদের তাকলীদ করবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মসজিদ

এম এম মোস্তফা

হবিগঞ্জ, সিলেট।

জিজ্ঞাসা : ১. বহুতল মসজিদে কোথাও ইমাম বরাবর, কোথাও মাঝখানে ছাদে ফাঁকা রাখা হয়। আবার কোথাও ফাঁকা রাখা হয় না। এ বিষয়ে শরীয়তের বক্তব্য কী?

২. বর্তমানে প্রায় মসজিদেই ইমামের পেছনে কমিটির লোক, এলাকার নেতা, মুরব্বিরা নামাযে দাঁড়ান, কোনো কোনো মসজিদে তাদের জন্য পৃথক মুসল্লা বিছানো থাকে। অথচ তাদের ইমামতির যোগ্যতা নেই। উক্ত স্থানে যদি কোনো আলেমও দাঁড়ায় কমিটির লোকজন রাগান্বিত হয়। এ বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশনা কী?

সমাধান : ১. বহুতল মসজিদের ছাদে ফাঁকা রাখা মূলত মুক্তাদীগণ ইমামের অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করার জন্য। সুতরাং অন্য কোনো উপায়ে যথা মাইক, বা মুকাব্বির ইত্যাদির মাধ্যমে ইমাম সাহেবের অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করার ব্যবস্থা থাকলে ফাঁকা না রাখলেও অসুবিধা নেই। (রাদ্দুল মুহতার ১/৫৮১, আল ফাতাওয়া আততাতারখানিয়া ১/৪৪৪, নেহায়াতুল আহকাম ফী মারেফাতিল আহকাম ২/১২০)

২. মসজিদে কারো জন্য জায়গা নির্ধারণ করে রাখলেও তা নির্ধারিত হয় না। বরং আগে এলে সেখানে যে কেউ বসতে পারবে। আর ইমামের পেছনে সেই দাঁড়ানোর উপযুক্ত, যে ইমামতি করার যোগ্যতা রাখেন। যেন ইমামের ভুল সংশোধন বা প্রয়োজনের সময় ইমামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। (রাদ্দুল মুহতার ১/৬০০, আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া ১/৯৫, আল বেনায়া ২/৪৪৮)

প্রসঙ্গ : খতম তারাবীহ

মুজাম্মিল হোসাইন

বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : আমাদের মসজিদে রমাজান মাসে দুজন হাফেয দ্বারা তারাবীহ পড়ানো হয়। মসজিদ কমিটির তথ্য মতে, রমাজানের ২৭ তারিখে কমিটি হাফেয সাহেবেদেরকে খতম তারাবীহ শেষ করার পর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে। উল্লেখ্য, কমিটির মতে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ পূর্বনির্ধারিত নয় বরং তা ২৭শে রমাজানেই নির্ধারিত হয় কমিটি দ্বারা। আরো উল্লেখ্য, কমিটির মতে, এ অর্থ প্রদান করা হয় হাফেয সাহেবদের থাকা, খাওয়া ও যাতায়াত খরচ বাবদ। (যদিও দুজন হাফেয আসেন ভিন্ন ভিন্ন এলাকা হতে এবং তাদের একই পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়)।

ধরেন, একজন হাফেজ উত্তরা থেকে আসেন এবং তারাবীহ পড়ানোর পর চলে যান। অপরজন কুমিল্লা হতে আসেন এবং এলাকাস্থ এক ব্যক্তির বাড়িতে থাকেন। এ বাড়িতেই তার খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়। যার বাড়িতে হাফেয থাকেন তিনি হাফেয সাহেবের থাকা-খাওয়ার খরচ বাবদ অন্য কারো থেকে অর্থ গ্রহণ করেন না। (অর্থাৎ তাকে কোনো অর্থ প্রদান করা হয় না)।

জানার বিষয় হলো ক. এরূপ উপায়ে অর্থ দেওয়া ও নেওয়া জায়েয হবে কি না? খ. এভাবে প্রদেয় অর্থ কি পারিশ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হবে? গ. এই হাফেয সাহেবদের পেছনে তারাবীহর নামায পড়লে নামায আদায় হবে কি না? ঘ. নামায আদায় হলেও সওয়াব পাওয়া যাবে কি না?

সমাধান : রমাজান মাসে তারাবীহে খতম শোনানোর বিনিময় দেওয়ার যেহেতু প্রচলন রয়েছ, তাই চুক্তিভিত্তিক হোক বা চুক্তি ছাড়া হোক উভয় অবস্থাতে বিনিময় দেওয়া ও নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। এ ধরনের হাফেযের পেছনে তারাবীর নামায সহীহ হলেও পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই খাওয়া-দাওয়ার টাকা দেওয়া হয়েছে বক্তব্যটি অমূলক। (রাদ্দুল মুহতার ২/৭৩, এমদাদুল ফাতাওয়া ২/৩২১)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহাম্মদ মনির উদ্দীন

ইকুরিয়া, দ. কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : মসজিদের অযুখানার ছাদের ওপর মেস ভাড়া দেওয়া আছে। এখন উক্ত ছাদের ওপর (অযু ও মেসের ছাদ) মোবাইল ফোন কোম্পানি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে টাওয়ার বসাতে চায়।

উক্ত টাওয়ারটি বসানো শরীয়তসম্মত হবে কি না?

সমাধান : মসজিদসংলগ্ন যে অংশটুকু মসজিদের প্রয়োজনে তথা অযুখানা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হচ্ছে তা শরয়ী মসজিদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তার উপরাংশ মসজিদের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন থাকা, মুসল্লীদের দুর্ভোগ সৃষ্টি না হওয়া, যাতায়াতের জন্য ভিন্ন রাস্তা হওয়ার শর্তে বৈধ কাজের জন্য বাড়া দেওয়া

জায়েয। আর অবৈধ কাজের জন্য ভাড়া দেওয়া ন জায়েয। যেহেতু মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার বৈধ-অবৈধ উভয় ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত অজুখানার ছাদ মোবাইল টাওয়ার বসানোর জন্য ভাড়া দেওয়া জায়েয হলেও মসজিদের পবিত্রতার দিক লক্ষ করে ভাড়া না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। (আল বাহরুর রায়েক ৫/৪১৮, ফতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৬/৯৮

প্রসঙ্গ : জমিজমা

মুহাম্মদ নবী হোসেন
বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্প, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : আমি ১৯৫৯ সালে কয়েক খণ্ড জমি মূল মালিক থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে ক্রয় করেছি। কিন্তু পরবর্তীতে মূল মালিকের ওয়ারিস থেকে ক্রয়সূত্রে কয়েকজন লোক ওই জমির মালিক হয়েছে ও তারা ওই জমির রেকর্ড করেছে। বর্তমানে তারা ওই জমিতে বসবাস করছে।

আমার জানার বিষয় হলো, কোর্টকাছারির দ্বারা আমি যদি তাদেরকে ওই জমি থেকে সরিয়ে দিই তবে তারা কোনো অভিশাপ দিলে সে অভিশাপে আভিশপ্ত হব কি না? কুরআন-হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

সমাধান : প্রশ্নে বর্ণনা অনুযায়ী আপনি মূল মালিক থেকে যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে উক্ত জমি ক্রয় করে থাকেন তাহলে আপনি আপনার ন্যায্য সম্পত্তি উদ্ধারের ক্ষেত্রে কোর্টকাছারি বা যেকোনো বৈধ পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধী ও অভিশপ্ত হবেন না। (সূরা নিসা ৫৮, আদদুররুল মুখতার ২/২১, হেদায়া ২/৮৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১৪/২৮৯)

প্রসঙ্গ : হজ

কাজী মাওলানা আব্দুল আওয়াল
শায়েস্তাগঞ্জ, হগিঞ্জ।

জিজ্ঞাস : ক. নিজে হজ না করে বদলি হজ করা যাবে কি না? খ. কাবা শরীফ দেখামাত্র হজ ফরজ হয়ে যায়। কথাটি হাওয়ালাসহ জানতে চাই। গ. আমার ছেলে সৌদিপ্রবাসী। প্রবাসী অবস্থায় হজ করলে তার হজ আদায় হবে কি না? নাকি জন্মভূমি থেকে হজ করতে যেতে হবে?

সমাধান : ক. বদলি হজ এমন ব্যক্তির দ্বারা করানো উত্তম, যে নিজে হজ করেছে। তবে যদি এমন ব্যক্তির দ্বারা করানো হয় যে ইতিপূর্বে হজ করেনি। তাহলে এ ক্ষেত্রে বদলি হজ আদায় হলেও মাকরূহ হবে। (রাদ্দুল মুহতার ২/৬০৩, বাদায়েউস সানায়ে ৩/২৭৪, আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া ১/২৫)

খ. শুধু কাবা শরীফ দেখলে হজ ফরজ হয় না বরং হজের মাসসমূহে কেউ যদি মক্কা শরীফ পৌঁছে এবং অন্য কারো বদলি হজের এহরাম অবস্থায় না থাকে এবং হজ সম্পন্ন করা পর্যন্ত অবস্থানের সামর্থ্য থাকে তাহলে তার ওপর হজ ফরজ হবে। অন্যথায় নয়। (রাদ্দুল মুহতার ২/৪৬০, বাদায়েউস সানায়ে ৩/৫৭, জাওয়াহেরুল ফিকহ ১/৫০৭)

গ. প্রবাসী অবস্থায় হজ করলে তার নিজের হজ আদায় হয়ে যাবে। জন্মভূমি থেকে গিয়ে করতে হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার আলা সাদরী রাদ্দিল মুহতার ২/৪৭৮, রাদ্দুল মুহতার ৪৭৮)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

আলহাজ মুহা. আবুল বাশার
দক্ষিণখান, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : আমাদের মসজিদখানা প্রায় ৪০ বছরের পুরনো। সাথে ১৮ ফুট প্রস্থ পাকা রাস্তা। রাস্তা থেকে মসজিদের নিচতলা কয়েক ফুট নিচু। উক্ত নিচু জায়গায় পাঞ্জেগানা নামায ও জুমুআর নামায পড়তে হয়। এ ছাড়া অনেক ঘনবসতি। মূল মসজিদ ফাউন্ডেশন ছাড়া তিনতলা পর্যন্ত করা হয়েছে। রাস্তায় দুই-তিনশত মুসল্লী নামায আদায় করেন। কমিটি মসজিদের নির্মাণকাজে হাত দিতে চায়। তাই নিচতলায় দোকান, পানি সংগ্রহের ট্যাংক ও অযুখানা করে দ্বিতীয় তলা থেকে পাঞ্জেগানা ও জুমুআর নামায পড়া যাবে কি না তা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর নির্মাণকাজ আরম্ভ করতে আমরা ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে সমাধান জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধান : কোনো জায়গায় একবার শরয়ী মসজিদ সাব্যস্ত হওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত তার তলদেশ থেকে আকাশ পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে। তাতে শুধু নামাযের স্থান ছাড়া অন্য কিছু করার অনুমতি নেই। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদ পুনর্নির্মাণকালে পূর্বের মসজিদের কোনো অংশে উপরে নিচে দোকান পানির ট্যাংক বা অযুখানা বানানো যাবে না। (আদ্দুররুল মুখতার আলা সদরি রাদ্দিল মুহতার ৪/৫৫৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৪২৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১/৫৩৯)

প্রসঙ্গ : মাদরাসা পরিচালনা

মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম
পুলিশ লাইনস, জামালপুর।

জিজ্ঞাসা : সম্প্রতি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এমন কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যারা ধর্ম সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখেন না। যেমন কোনো আত্মস্বীকৃত চোরাকারবারি অথবা কোনো অশ্লীল চিত্রনাট্য পরিচালক/অভিনেতা অথবা কোনো প্রকাশ্যে মদ্যপায়ী ব্যক্তি (এমনকি মিম্বারে বসে মদপান করে বলে লোকমুখে শোনা যায়) অথবা কোনো ব্যভিচারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত কোনো পরিচালনা কমিটি কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারবে কি না? উল্লেখ্য, এরূপ ব্যক্তিবর্গের চেয়েও অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি এলাকায় আছেন। এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধান : ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হলো

ইসলামের নিদর্শন। তাই এর পরিচালনা কমিটির সদস্যকে হতে হবে আমানতদার, দ্বীনদার, মুত্তাকী ও পরহেজগার এবং পরিচালনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আর কমিটিতে কমপক্ষে দু-একজন বিজ্ঞ হাক্কানী আলেম সদস্য থাকা উচিত। সমাজে এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপস্থিত থাকা অবস্থায় প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি গঠন করা বৈধ নয়। (রাদ্দুল মুহতার ১/৩৮৩, ফতাওয়ায়ে রহীমিয়া ১০২৩৫, কেফায়াতুল মুফতী ৭/১৭৩)

প্রসঙ্গ : মাদরাসার দোকান ভাড়া

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
সদর বগুড়া।

জিজ্ঞাসা : মাদরাসার নামে ওয়াকফকৃত জামিতে মার্কেট বা দোকান নির্মাণ করে এমন লোকদের নিকট ভাড়া দেওয়া যারা শরয়ী দৃষ্টিকোণে গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে না। পরবর্তীতে ভাড়াটিয়া সেখানে গুনাহের কাজে লিপ্ত হলে বা গুনাহের কাজ তথা গানবাদ্য, টিভি ও তাস খেলা ইত্যাদি করলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ গুনাহগার হবে কি না? এবং ভাড়া হালাল হবে কি না? ভাড়া হালাল হলেও এ ধরনের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের নিকট মাদরাসার দোকান ভাড়া দেওয়া উচিত হবে কি না?

সমাধান : চুক্তি লঙ্ঘন করে ভাড়াটিয়া সেখানে গুনাহের কাজে লিপ্ত হলে বা গুনাহের কাজ সংঘটিত করলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ গুনাহগার হবে না। এবং দোকানগুলোর ভাড়া হালাল হবে। তবে এ ধরনের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের নিকট মাদরাসার দোকান ভাড়া দেওয়া উচিত নয়। তাই চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে এ ধরনের লোক থেকে মাদরাসার দোকান খালি করে অন্য নেককার লোকের নিকট ভাড়া দেবে। (আল-আশবাহ ওয়াননাযায়ের ২২, ফতাওয়ায়ে দারুল উলূম ১৫/৩১৮, আদ্দুররুল মুখতার ২/২৪৭)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহাম্মদ মকসুদুর রহমান
গাজীপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : ক. একই ছাদের নিচে মসজিদের দেয়াল ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের আলাদা দেয়াল ও আলাদা সিঁড়ি এবং বাসার আল্লাদা দেয়াল ও আলাদা সিঁড়ি সেই বাসায় ইমাম সাহেব তার পরিবার নিয়ে থাকতে পারবেন কি না? খ. মসজিদের দাতা এককভাবে মসজিদ নির্মাণ করে সেই মসজিদের চতুর্থ তলায় দাতা যদি মাস্তরাতের জামাআতের জন্য অথবা মাস্তরাতের তালিমের জন্য নির্ধারিত করে তা জায়েয হবে কি না?

সমাধান : ক. মসজিদ নির্মাণকালে যদি উক্ত বাসা মসজিদ থেকে পৃথক রাখা হয় এবং পরিবার নিয়ে থাকলে পর্দা ও শিশুদের শোরগোল ইত্যাদির কারণে নামাযীদের অসুবিধা না হয় তাহলে ইমাম সাহেব পরিবার-পরিজন নিয়ে উক্ত বাসায় থাকতে পারবেন। (আলবাহরুর রায়েক ৫/৪২১, কেফায়াতুল মুফতী ৩/১৭৯)

খ. শরয়ী মসজিদ নির্মিত হলে তার নিচ থেকে আকাশ পর্যন্ত পুরোটাই মসজিদ হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায়। এর কোনো অংশ নামায ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার অনুমতি শরীয়তে নেই। উপরন্তু মহিলাদের ইবাদত-বন্দেগী শিক্ষাদীক্ষা–সব কিছু নিজেদের বাসা-বাড়ির সাথে সম্পৃক্ত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্মিত মসজিদের চতুর্থ তলা মাস্তরাতের জামাআত বা তালীমের জন্য নির্ধারিত করা শরীয়ত অনুমোদিত নয়।

প্রসঙ্গ : কোয়ান্টাম মেথড

মাহমূদুল হাসান
সদর, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা : ১. মুরাকাবা যা আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে একটি প্রসিদ্ধ অধ্যায়। চার তরীকার আওলিয়া মাশায়েখগণের মাঝে যার চর্চা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, উক্ত মুরাকাবার মাঝে মনোযোগ বৃদ্ধি ও তাকে আরো উন্নত স্তরে পৌঁছানোর জন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মেডিটেশন, শিথিলায়ন বা ধ্যানমগ্নতার কোনো পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করা শরীয়তসম্মত হবে কি না? অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিথিলায়নের মাধ্যমে মনস্থির করে তাতে আল্লাহ তা'আলার জাত বা কবর ও মৃত্যু ইত্যাদির মুরাকাবা করা যাবে কি না? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হবো।

২. তদ্রূপ নামাযে মনস্থির করার জন্য উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন কেমন?

সমাধান : আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে মুরাকাবা আল্লাহর ধ্যান ও তাঁর ভয়ভীতি অন্তরে জাগরণের অন্যতম মাধ্যম বা সহায়ক। যা একমাত্র শরীয়তের ধারক-বাহক, মোত্তাবেয়ে সুন্নাত আল্লাহওয়ালা, সুফি-সাধকের দিকনির্দেশনায় হয়ে থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মেডিটেশন, শিথিলায়ন বা ধ্যানমগ্নতার বিভিন্ন পদ্ধতি আধ্যাত্মিক কোনো মনীষী আল্লাহওয়ালার আবিষ্কার নয় বিধায় এটা আধ্যাত্মিক সাধনার কোনো বিষয় নয়। বরং এটা পণ্ডিতের নিজস্ব আবিষ্কৃত পন্থা। এর সাথে সুফি-সাধকদের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এসব পন্থা শরীয়তের সর্বস্তরেই বর্জনীয়।

২. যদিও নামাযে মনস্থির রাখার নির্দেশ আছে, কিন্তু উক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো শরীয়তসম্মত না হওয়ায় নামাযে মনস্থির করার জন্য উক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা জায়েয নেই। (শারহুল ফিকহিল আকবার ১১৫, কেফায়াতুল মুফতী ২/১১০)

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

দ্বীনের বেশে দুনিয়া অর্জন

হযরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলেন, দুনিয়ার বেশে দুনিয়া অর্জন এত ক্ষতিকর নয়, যতটা দ্বীনের বেশে দুনিয়া অর্জন করা ক্ষতিকর। (আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ)

অহেতুক কথা বর্জন করো

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যে কথায় কোনো ফায়দা নেই তা বর্জনীয়। এ কথার ওপর যার আমল হবে তার জীবন বড় মধুর হবে। সে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করতে পারবে। অহেতুক কথায় অনেক সময় নষ্ট হয়। (কামালাতে আশরাফিয়্যা ২২৩)

ভালো কথা বলো, নতুবা চুপ থাকো

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) বলেন, জিহবা খোদা প্রদত্ত একটি মেশিন। যা আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবানী ও দয়ায় মানব জাতিকে দান করেছেন। যেন তা এমন কাজে ব্যবহার করে, যা তার দ্বীন বা দুনিয়ার জন্য ফলপ্রসূ হয়। অতএব তা এমন কাজে ব্যবহার করা, যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো ফায়দা নেই, তা হবে খোদা প্রদত্ত মেশিনের অপব্যবহার। অহেতুক কথায় সর্বদিক দিয়ে ক্ষতিই ক্ষতি। তাই তো হাদীস শরীফে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে বর্ণিত আছে "তিনি অল্প কথা বলতেন এবং দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতেন।" হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়, তিনি নিজ আংটির ওপর নকশা করে রেখেছেন, قل الخير والا فاصمت অর্থাৎ ভালো কথা বলো, নতুবা চুপ থাকেন। (মাজালেসে মুফতিয়ে আজম ৩৮০)

বেয়াদবীর কুফল ও শিষ্টাচারের সুফল

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী তৈয়ব সাহেব (রহ.) বলেন, আমাদের নজরে এমন অনেক আলেম আছেন, যারা দারুল উলূম দেওবন্দে তা'লীম পেয়েছেন। ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু উস্তাদদের সাথে বেয়াদবীর আচরণ করতো। ফারেগ হওয়ার পর দেখা গেছে, তারা ইলমের খেদমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কেউ দোকানদারি করছেন, কেউ গাড়ির ড্রাইভারি করছেন। এ সুযোগ তাদের হয়নি যে, তারা মুহাদ্দিস বা মুফাসসির হবেন। পক্ষান্তরে এমন কিছু আলেমও আমাদের নজরে আছেন, যাদের যোগ্যতা ও জ্ঞানশক্তি খুবই সীমিত ছিল। কিন্তু উস্তাদদের সাথে সম্মানমূলক আচরণ করতেন। এখন আমরা দেখছি, তারা দ্বীনের এত খেদমত করছেন, যা বড় বড় অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমরাও করতে সক্ষম হচ্ছেন না। একমাত্র শিষ্টাচারের কারণেই তারা এত মকবূল হয়েছেন। (খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম ৩/২৭৭)

আলেমের পদস্খলন সারা জাহানের পদস্খলন

ফখরুল উলামা মাও. হাবীবুর রহমান উসমানী (রহ.) বলেছেন, উলামায়ে কেরামের দৃঢ়তার মধ্যেই সারা জাহানের নাজাতের রহস্য লুকায়িত আছে। এবং তাদের পদস্খলনেই সারা জাহান ধ্বংস হয়ে যাবে। (আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ)

উভয় জাহানের সফলতা কোথায়?

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে, অধিকাংশ ঝগড়া-ফ্যাসাদ আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার কারণেই সংঘটিত হয়। তার একমাত্র চিকিৎসা এই যে, মুসলমান নিজের ব্যক্তিগত রায় এবং উদ্দেশ্যকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের (সা.) হুকুমসমূহকে সর্বোচ্চ মাপকাঠি মেনে নিয়ে তার অধীন করে নেয়া, তার শেষফল হবে নিঃসন্দেহে উভয় জাহানের সফলতা। (আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ ৯১)

ধার্মিকতার শেষ ধাপ

শায়খুত তাফসীর আল্লামা মুহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব কান্দেলভী (রহ.) বলেন, যুহদ তথা ধার্মিকতার শেষ ধাপ হলো, ধন-সম্পদ অর্জনে এত খুশি না হওয়া যাতে অহংকার সৃষ্টি হয় এবং ধন-সম্পদ চলে যাওয়াতে এত চিন্তিত না হওয়া যাতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়। (প্রাগুক্ত ২৫৮)

মুসলমানের জীবনের সারাংশ

হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মদ জালন্দরী (রহ.) বলেন, কুরআনে কারীমের সারাংশ হলো, আল্লাহ পাককে ইবাদতের মাধ্যমে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আনুগত্যের মাধ্যমে এবং মাখলূককে খিদমাতের মাধ্যমে রাজি (সন্তুষ্ট) রাখা। (প্রাগুক্ত ২৯১)

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta RoadHatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424, Mobile: 01675303592, 01711527232

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 0980/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039, Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩